সেঞ্চুরিস্
নস্ত্রাদামু

সেঞ্চুরিস্

নস্ত্রাদামু

সংকলক : অসীম চট্টোপাধ্যায়

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ।। ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ।। কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৩৯৫
আগস্ট ১৯৮৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ
অগ্রহায়ণ ১৩৯৭
ডিসেম্বর ১৯৯০
তৃতীয় পরিমার্জিত ও
পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ
শ্রাবণ ১৩৯৮
আগস্ট ১৯৯১

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছপট
গৌতম রায়

মুদ্রক
প্রদীপকুমার ধর
প্রিন্ট-ও-গ্রাফ
৯ সি ভবানী দত্ত লেন
কলকাতা ৭০০০৭৩

২৫ টাকা

ঝিলাম
অভিমন্যু
আর
সপ্তর্ষিকে
যাদের চোখেই খুঁজে বেড়াই

১৯৮৬ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে শুরু হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ধ্বংসের মুখোমুখি হবে সারা দুনিয়া।

কথাটা আজকের নয়। চারশ বছর আগে, ফ্রান্সের এক অমোঘ ভবিষ্যদ্বক্তা উচ্চারণ করেছিলেন এই ভয়ঙ্কর কথাগুলো। নাম তাঁর মিশেল দ্য নস্ত্রাদামু, যিনি চিহ্নিত হয়েছেন 'ভবিষ্যদ্বক্তাদের রাজা' নামে।

প্রায় সাড়ে ন'শো ভবিষ্যদ্বাণী লিখে গিয়েছিলেন নস্ত্রাদামু। তার বহুলাংশ আশ্চর্য-জনকভাবে সঠিক—প্রমাণ দিয়েছে ইতিহাস। চারশ বছর আগের সেই মানুষ, নস্ত্রাদামু, ঘোষণা করেছিলেন—বিংশ শতাব্দীতে জার্মানীর বুকে উদিত হবে এক স্বৈরাচারী, নাম যার হিস্টার (হিটলার), যে সারা পৃথিবীকে টেনে নিয়ে যাবে যুদ্ধে রক্তঝরা প্রান্তরে, নির্যাতন করবে মনীষীদের, আর যার প্রতীক-চিহ্ন হবে বাঁকানো ক্রশ (স্বস্তিকা)! ফ্রান্সে নেপোলিয়ঁ বোনাপার্টের অভ্যুত্থানেরও নির্ভুল ইঙ্গিত দিয়েছিলেন নস্ত্রাদামু। আরও অজস্র ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে আছে—আজকের মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা, পারমাণবিক অস্ত্র, মহাকাশ অভিযান, মারী আঁতোয়ানেত, বা বিংশ শতাব্দীর টলোমলো ইউরোপ—সব কিছু। আর আছে রাজনৈতিক ক্ষমতায় অথবা তার খুব কাছাকাছি থাকা একই পরিবারের তিন সদস্যের হত্যার ইঙ্গিত, যা ঘটবে বর্তমান শতাব্দীতে। আমরা হিসেব মেলাই আমেরিকার কেনেডি পরিবারের ঘটনা সাজিয়ে—জন-রবার্ট এবং জীবিত এডওয়ার্ড। —অথবা ভারতের গান্ধী পরিবার—ইন্দিরা, রাজীব এবং দুর্ঘটনায় নিহত সঞ্জয়।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষথাবার বিধ্বস্ত পৃথিবীর পরিত্রাতা কি জন্ম নেবে আমাদের এই ভারতবর্ষের মাটিতেই? তার নেতৃত্বে ভারত কি পরিণত হবে বিশ্বের প্রধান শক্তিতে? সেরকম একটা ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায় নস্ত্রাদামুর লেখায়। সেইসঙ্গেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় আগামী পৃথিবীর অজস্র গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার।

নস্ত্রাদামুর এইসব আশ্চর্য, অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী, তার বিশ্লেষণ এবং ঐ রহস্যের মানুষটির বর্ণময় জীবন নিয়েই এ বই। কুয়াশার আস্তরণ সরিয়ে অতীতের পৃষ্ঠা থেকে এক অজানা অধ্যায়কে উদ্ধার করার চেষ্টা।

এ সংস্করণে মূল বইয়ের প্রচুর পরিমার্জনা করা হয়েছে, যোগ করা হয়েছে তিনটি নতুন পরিচ্ছেদ, অনেক জায়গায় যোগ করা হয়েছে নতুন ব্যাখ্যা।

—অসীম চট্টোপাধ্যায়

১

নস্ত্রাদামুর সন্ধানে

শরৎকালের বিকেল। ইংল্যাণ্ডের শরীর জুড়ে রোদ্দুরের ঝিল্‌ঝিকমিক খেলা। হালকা হাওয়ায় মানুষের শরীরে কেমন এক জ্বর-জ্বর ছোঁয়া। সেই বিকেলের কথা।

টেলরিয়ান্ লাইব্রেরীতে বসে আছে এক অষ্টাদশী তরুণী—এরিকা শিথ্যাম্। নিজের গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বই-এর খোঁজে এসেছে এরিকা। ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার সোনার খনি টেলরিয়ান্ লাইব্রেরী। বই আনতে বলে বসে আছে অষ্টাদশী। মাথার মধ্যে হাজারো ভাবনার মিছিল।

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ছাত্রী এরিকা শিথ্যাম্। আধুনিক ভাষা এরিকার বিষয়বস্তু ছিল। অক্সফোর্ডে প্রথম বছরটা আধুনিক ভাষার বহতা নদীর মাঝেই ভেসে বেড়িয়েছে ও। কিন্তু, এই তরুণীর মস্তিষ্কের গতিবিধি কিঞ্চিৎ বিচিত্র। ঝকমকে বর্তমানের চেয়ে হারিয়ে-যাওয়া অতীতের দিকেই তার দুর্নিবার আকর্ষণ। এই অমোঘ টান ওকে সরিয়ে নিয়ে গেছে ছক-বাঁধা পথ থেকে। বিষয়বস্তু পাল্টেছে এরিকা—অক্সফোর্ডের দ্বিতীয় বছরে। ফ্রান্সের প্রভাঁস প্রদেশের প্রাচীন ভাষা (Langue d'Oc) আর তার নানান উপভাষা হয়ে উঠেছে ওর প্রধান বিষয়বস্তু। এ বিষয়ে পড়াশোনা করনে-ওয়ালার সংখ্যা নিতান্তই অল্প। প্রচুর পরিশ্রম, লাতিন ভাষাটা ভাল ভাবে জানা দরকার, বোঝা দরকার শব্দতত্ত্ব। সেই কবেকার সপ্তম শতাব্দী থেকে শুরু করে ১৪৯২ সাল—এই দীর্ঘ সময়ের খাঁজে খাঁজে পা ফেলে এগোতে হবে।

বন্ধুরা উদ্বিগ্ন হয়েছিল—কী পাগলামি করছে এরিকা! এক চমৎকার ভবিষ্যতের পথ ছেড়ে কোন্-এক রহস্যময় অতীতের হাতছানিতে সাড়া দিয়ে কোথায় পৌঁছবে ও?

টেলরিয়ান্ লাইব্রেরীর টেবিলে বসে আছে অষ্টাদশী এরিকা। মুখে বিরক্তির ছায়া। বইটার পাত্তা নেই। আহ্, কোথাও কি স্বস্তি নেই, কোথাও না!

সামনের টেবিলে একটা বই এসে পড়ে। অলস চোখে তাকায় এরিকা। এ তার প্রয়োজনীয় বইটা নয়। কি-একটা হাবিজাবি বই। মাপেও ছোট।

লম্বায় ইঞ্চি পাঁচেক, চওড়ায় ইঞ্চি তিনেক হবে। ক্রুদ্ধ চোখে লাইব্রেরীয়ানের দিকে তাকায় ও। লোকটা করছেটা কী? আহ্, এদের জ্বালায় এবার পড়া-ফড়া ছেড়ে দিয়ে একখানা বিউটি পার্লার খুলে বসতে হবে দেখছি! এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই, এক ফোঁটা বোধ নেই! অস্থির হয়ে ওঠে তরুণী।

আনমনে সামনে পড়ে থাকা বইটির দিকে হাত বাড়ায় ও। কী আর করা যায়। এই খুদে বইটাই নাড়া-ঘাঁটা করা যাক একটু।

অ, ফরাসী ভাষার বই। কী নাম কেতাবখানার? পাতা ওলটায় এরিকা—বইয়ের পাতা, আর জীবনের পাতা। নামের জায়গায় লেখা—Les Propheties de M. Michel de Nostradamus, ছাপা হয়েছে ১৫৬৮ সালে। নস্ত্রাদামু? কে বাপু তুমি? কোন্ বাণিজ্যে নিবাস তোমার? চারশো বছর আগে কী-সব ছাইপাঁশ লিখে গেছো হে? নিছক সময় কাটানোর জন্য পাতা ওলটায় এরিকা।

এলোমেলোভাবে পাতা ওলটায় অষ্টাদশী তরুণী। চোখ দুটো বই-এর দিকে, মনটা অন্যত্র। তাছাড়া, এ একটা বই হলো! কি একরাশ চতুষ্পদী কবিতার গোয়াল! এইসব বই-পত্তোর....

আরে, এটা... এটা কী?

বিশেষ একটা চতুষ্পদীর চৌহদ্দীতে চোখ দুটো স্থির হয়ে যায় এরিকার। আশ্চর্য! বইটার ওপর ঝুঁকে পড়ে এরিকা।

ক্ষুধায় উন্মত্ত পশুরা পার হবে নদী, যুদ্ধের বৃহত্তর অংশটা হবে হিস্টার (hister)-এর বিরুদ্ধে। মহাপুরুষদের সে বন্দী করবে লোহার খাঁচায়, আর জার্মানীর সন্তান কোন আইনই মানবে না।

—দ্বিতীয় শতক, ২৪-তম চতুষ্পদী

যুদ্ধ? জার্মানী? এবং—হিস্টার? মহাপুরুষদের বন্দী করা হবে? আইন মানবে না?

বোডলিয়ান্ লাইব্রেরীর টেবিলে প্রাচীন ভাষার ছাত্রী এরিকা শিথ্যাম্ উত্তেজনায় কাঁপছে। বইটা প্রকাশিত হওয়ার বছরটা আবার দেখে ও—হ্যাঁ, ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দ!

বিদ্যুৎ খেলে যায় এরিকার মস্তিষ্কের কোষে কোষে। হিস্টার—এবং জার্মানীর হিট্লার! ১৫৬৮ সাল থেকে কয়েক শতাব্দী পার হয়ে ১৯৩০-এর

দশক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জার্মানীর কারাগারে বন্দী অটো হান্‌, হাইজেনবার্গের মত বিজ্ঞানীরা, আরও অসংখ্য মননশীল ব্যক্তি। নীল্‌স্‌ বোর, অ্যাল্‌বার্ট আইনস্টাইনরা দেশছাড়া। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ মৃত্যুপণ করে প্রতিরোধ করছে জার্মানীকে। আক্ষরিক অর্থেই জার্মানীতে তখন আইন চূর্ণবিচূর্ণ। আর—১৫৬৮ সালের এই খুদে বইতে কোন্‌-এক নস্ত্রাদামু প্রায় নির্ভুল ইঙ্গিত দিয়েছে এই পরিস্থিতির!

দ্রুত পাতা ওলটায় এরিকা। অজস্র চতুষ্পদীর মাঝে জার্মানীর ঠিকানা খোঁজে। হ্যাঁ, এই যে—হিস্‌টার হবে বাঁকানো ক্রশ-এর দলপতি। বাঁকানো ক্রশ? হিট্‌লারের প্রতীক-চিহ্নটা ভেসে ওঠে তরুণী পাঠিকার চোখের সামনে: স্বস্তিকা!

রহস্যঘন এক আচ্ছন্নতা ছেয়ে ফেলে এরিকাকে। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে ও। এই মুহূর্তে ওর মাথায় প্রাচীন ভাষা নেই, বন্ধুদের উপহাস নেই। পিছু-হাঁটা পথ বেয়ে ও এখন চারশো বছর আগে, চারশো বছর আগের ফ্রান্সে, আর ওর চিন্তার পর্দায় এক বিস্মৃত মানুষের কুয়াশা-ঘেরা অবয়ব—নস্ত্রাদামু!

'আপনার বই, মিস্‌ শিথ্যাম্‌!'

ষোড়শ শতাব্দী থেকে এরিকা ফিরে এল বিংশ শতাব্দীতে। প্রাচীন ভাষার সেই 'প্রয়োজনীয়' বইটা এসে গেছে। প্রয়োজনীয়? রহস্যময় হাসি খেলে যায় ওর ঠোঁটে। ঐ খুদে বইটার পাতা ওলটাতে গিয়ে নিজের জীবনের পাতাই উলটে ফেলেছে এরিকা। এখন আর ফেরার পথ নেই। এখন ঐ হারিয়ে-যাওয়া ফরাসীর ঠিকানামুখী যাত্রা।

খুদে বইটা তুলে নিয়ে যায় লাইব্রেরীয়ান। চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে পড়ে এরিকা। পায়ে পায়ে লাইব্রেরীর বাইরে।

ঘরে ফিরেও আচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি এরিকা। এ কোন্‌ রহস্যের দুয়ার আজ খুলে গেল তার সামনে! ভাবনার গভীরে ডুবতে চাইল ও। অসংখ্য চতুষ্পদী রয়েছে ঐ ছোট্ট বইটাতে। শুধু জার্মানী-যুদ্ধ-হিটলার নয়, লুকিয়ে রয়েছে আরও বহু কিছু, আরও অনেক আশ্চর্য ভবিষ্যৎবাণী। হয়ত-বা আজকের এই সমস্যাজর্জর পৃথিবীর আগামী ঠিকানা, ভবিষ্যতের ছবি ছড়িয়ে আছে ঐ-সব সেকেলে চতুষ্পদীর ছত্রে ছত্রে। নস্ত্রাদামু! মিশেল দ্য নস্ত্রাদামু! কে এই রহস্যময় নস্ত্রাদামু? কোন্‌ শক্তির বলে চারশো বছর আগের ফ্রান্সে বসে সে দেখতে পেয়েছিল আজকের পৃথিবীর চলচ্চিত্র?

মাথার মধ্যে এক আদ্যিকালের বাজনা বেজে চলে। দিন কাটে এরিকার। ইউনিভার্সিটিতে যায়, ক্লাস করে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে চায়ের আড্ডাতেও বসে।

সব কিছুর মধ্যে, সব কিছুর সঙ্গেই থাকে এরিকা। তবু, কোথাও যেন সে নেই, কেউ ঠিক পায় না তাকে। নিজস্ব পড়াশোনা, চিন্তা-ভাবনার বৃত্তেই নিজেকে আরও কঠিন করে বেঁধে নেয় ও।

তারপর, পৃথিবী পাক খায় সূর্যের চারপাশে। একবার নয়, অনেক-বার। অনেক দিন, অনেক রাত পার হয়ে আসে মানুষ। আর, এই ঘূর্ণ্যমান গ্রহের এক নিজস্ব চৌহদ্দির মাঝে—অষ্টাদশী তরুণী এরিকা অনেক পথ পেরিয়ে এক রহস্যের দরজা খোলে।

এই বছরগুলো জুড়ে এরিকা শিথ্যাম্ সন্ধান করেছে মিশেল দ্য নস্ত্রাদামুর। পেয়েছে অনেক কিছু। পেয়েছে নস্ত্রাদামুর গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের কপি, পেয়েছে সেই ফরাসীর পথচলার রূপরেখা। হ্যাঁ, শিহরণজাগানো হাজারো খবর এখন ওর হাতে। পৃথিবীর আজ পর্যন্ত হেঁটে আসা পথের খবর, আর, আগামীদিনের পৃথিবীর একরাশ স্বপ্ন-ভাঙানো ছবির বিষন্ন টুকরো।

ঝিম্-ধরা গোধূলিবেলায় আলো-আঁধারের মেশামিশির মাঝে চুপচাপ বসে চিন্তার রাশকে সাজাচ্ছিল এরিকা শিথ্যাম্। ষোড়শ শতাব্দী, অতীত, যুদ্ধ, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ, আর—নস্ত্রাদামুর সন্ধান।

২

কালো রাত্রির খামে

ষোড়শ শতাব্দীর ছায়া-মাখা রাত ফ্রান্সের শরীরে। কোথাও তখন শব্দ নেই, শুধু হাওয়ার দলের ওড়াউড়ি। আকাশে তারাগুলো জেগে আছে গমের দানার মত: আজ যেন পৃথিবীতে নতুন কিছু ঘটবে। আজ, এই ঝিপঝিপে রাত।

তখন ফ্রান্সের কোথাও কোনো ঘরে জেগে আছে একজন মানুষ। চেয়ারের বুকে তার ঋজু অবয়ব। অপলক, নিষ্কম্প দৃষ্টি। টেবিলের ওপর খুলে-রাখা একখানা বই—আয়াম্ব্লিখাস্-এর লেখা De Mysteriis Egyptorum. বারোশো বছর আগে, সেই চতুর্থ শতাব্দীতে, এ বই লিখেছিলেন আয়াম্ব্লিখাস্, আর এই ১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সামনে এসেছে তার পুনর্মুদ্রণ। এ বইতে লেখা আছে নানান রহস্যময় কথা।

ঘরের মাঝখানে একখানা পিতলের ট্রাইপড, তার ওপরে জলের পাত্র।

কেমন-এক হালকা আলোর রেখা যেন ছড়িয়ে পড়ছে ঐ পাত্রের গা থেকে। এইভাবেই বসতেন হারিয়ে-যাওয়া আয়াম্‌ব্লিখাস্, এভাবেই বসেছে আজ এই ফরাসী মানুষ। হাতে তার ছোট একখানা দণ্ড।

জলপাত্রের দিকে চোখ ঐ মানুষের—স্থির। সময় খরচ হবে পৃথিবীর অফুরান ভাঁড়ারের থেকে, ট্রাইপডে রাখা জলপাত্রের জলটুকু ফরাসীর চোখের আকাশে ধোঁয়াটে হয়ে উঠবে, বুঝি শুরু হবে মেঘের আনাগোনা। হ্যাঁ, ঐ, জলের মাঝে ধোঁয়া-ধোঁয়া ছাপ....

হাত তুললো সেই ফরাসী। হাতের দণ্ডটা ধীরে ধীরে স্পর্শ করলো জলপাত্রের জলকে। এবার দণ্ডটা সরিয়ে আনলো সে। দণ্ডের গা বেয়ে ঝরছে জল। নিজের পায়ে আর পোশাকের ধারে ধারে ঐ জলের প্রলেপ লাগালো সে।

তারপর—এক অদ্ভুত, গা-সিরসির অনুভূতি সারা শরীরে। যেন কোন পার্থিব বন্ধন নেই, পিছুটান নেই, এ পৃথিবীতে তার বুঝি কেউ নেই। আর ঐ হালকা আলোর ঝিরিঝিরি রেখা, ফরাসীর মাথায় উথালপাথাল, যেন-বা ঐ আলো তাকে সামনে ঠেলছে।

হঠাৎই, তিরতির করে কেঁপে ওঠে ঋজু অবয়বটা! একটা কণ্ঠস্বর! কার, কোথা থেকে আসছে? কী বলছে ঐ স্বর? মানুষটির শরীরে এতক্ষণে ভয়ের ছোঁয়া! এ কোন্ শক্তিকে জাগিয়ে তুলছে সে? চোখের সামনে কার যেন এক অচেনা মূর্তি! এক আশ্চর্য দীপ্তি!

ফরাসীর পাশে কে-যেন বসেছে এখন। রাত-জাগা মানুষটি এখন হাওয়ায় দুলছে রহস্যে।

কী-যেন দেখছে ফরাসী, শুনছে, আঁধার-ছোঁয়া ঘরে যেন শব্দ ভাসছে কত কত।

এমন একজন আসবে, যে নামে কখনও কোন ফরাসী রাজা ছিল না; এমন ভয়ঙ্কর বজ্র আগে আর আসেনি কোনদিন। আতঙ্কে কম্পিত হবে ইতালি, স্পেন আর ইংল্যাণ্ড। বিদেশী নারীদের দিকে থাকবে তার দারুণ মনোযোগ।

কে এই ফরাসী রাজা? বুঝে উঠতে পারেনি সেই মানুষ। শুধু আবছা কুয়াশা-ভাসা সময়ের জাল ভেদ করে ভেসে উঠতে চেয়েছে এক মুখ, এক বলিষ্ঠ মুখ, বুঝি অনেক দিন, অনেক বছর পরের। এক অজানা ভবিষ্যতের

মানুষ অস্পষ্ট হয়ে দুলেছে।

কিন্তু এখানেই তো শেষ নয়! এখনও যে শব্দের দোলা, কণ্ঠস্বরের হিম-ছোঁয়া পরশ! ষোড়শ শতাব্দীর ঘুমন্ত ফ্রান্সে সেই আচ্ছন্ন অবয়ব আবারও কেঁপে ওঠে।

ইতালির কাছাকাছি জন্ম নেবে এক সম্রাট, যার জন্য সাম্রাজ্যের প্রচুর ক্ষতি হবে।

ভয় পেয়েছে একলা ঘরে মানুষটি। কে আসবে এই ফরাসী দেশে, সে এক কোন্ অনাগত দিনের সম্রাট দু'হাতে মাখবে রাশি রাশি রক্ত? অদ্ভুত আঁধার এক ছেয়ে ফেলেছে তাকে—ভবিষ্যদ্বক্তাদের রাজাকে—মিশেল দ্য নস্ত্রাদামুকে।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে এরিকা শিথ্যামের হিসেবে ভুল হয়নি। বিষণ্ণ চোখের সামনে অতীতের মিছিল ভেঙে ফুটে উঠেছে একটা নাম—বোনাপার্ট! নেপোলিয়ঁ বোনাপার্ট! ফ্রান্সের রাজাদের নামের তালিকায় একেবারেই নতুন একটা শব্দ—বোনাপার্ট! লুই, হেন্‌রি, চার্লস, ফ্রান্সিসদের সারির বাইরে একেবারে নতুন নাম নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল নেপোলিয়ঁ। ইংল্যাণ্ড অথবা গোটা ইওরোপ কেঁপে কেঁপে উঠেছিল আতঙ্কে। ইতিহাস আজও সে আতঙ্ককে জিইয়ে রেখেছে নিজের ক্ষতবিক্ষত শরীরে।

আর বিদেশী নারী? ছোট্ট হাসির রেখা এরিকার ঠোঁটে। জোসেফাইন আর মারি লুইস—নেপোলিয়ঁর দুই ভিনদেশী স্ত্রী। এই দুই নারীর প্রতি ঐ ফরাসী নৃপতির অনুরাগের কথা তার অজানা নয়।

ইতালির কাছাকাছি জন্ম নেবে সে! নেপোলিয়ঁ বোনাপার্টের জন্মস্থানটা ভেবে নিতে দেরী হয়নি বিংশ শতাব্দীর নারীর: কর্সিকা! হ্যাঁ, কর্সিকা—ইতালির কাছেই সাম্রাজ্যের ক্ষতি? নেপোলিয়ঁর কারণে ফ্রান্সের ক্ষতির খতিয়ানের জন্য গবেষণার প্রয়োজন হয় না।

নির্ভুলভাবে মিলে গেছে মিশেল দ্য নস্ত্রাদামুর ভবিষ্যৎ-দর্শন। এরিকা শিথ্যাম্ বিস্মিত হয়েছে, এরিকা শিথ্যাম্ বিষণ্ণ হয়েছে। নেপোলিয়ঁ বোনাপার্ট না-হয় অতীতের ধূসর পৃষ্ঠা। কিন্তু, নস্ত্রাদামূ যে এখনও পর্যন্ত অনাগত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও অনেক কথা বলে গেছেন, অনেক! যে ভবিষ্যৎ এগিয়ে আসছে ১৯৮০-র দশক, ১৯৯০-এর দশক, ২০০০ সালের ঠিকানায়!

বুকের মধ্যে যন্ত্রণার কাঁপন। দু'হাতে মুখ ঢেকেছে এরিকা। যেন না

মেলে, নস্ত্রাদামুর ভবিষ্যৎ-দর্শন ব্যর্থ হয় যেন। বড় নির্মম, বড় অন্ধকারের প্রবক্তা নস্ত্রাদামু!

ফ্রান্সের সালোঁ-আঁ-প্রভাঁস ভোরের হাওয়ায় চোখ মেলছে। শীতের ভোর। ফ্রান্সের ডিসেম্বর। হিমেল ছোঁয়া এই ভোরের চুম্বনে। ক্রুদ্ধ সর্পরাজ যেন ফুঁসছে মাটির বুকে।

ছাদের ঘর থেকে ধীর পায়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে মিশেল। ছাদের এই ছোট ঘরটাকেই নিজের স্টাডি-রুম করে নিয়েছে ও। এই নির্জনে ভবিষ্যৎকে মুঠোয় ধরতে সুবিধে হয়।

আর তখন, দোতলার বেডরুম থেকে পায়ে পায়ে বেরিয়ে এসেছে এক নারী—অ্যান্ পঁসার্ত গেমেল্। আজ ১১ ডিসেম্বর। একটা মাস। ঠিক একটা মাস আগে অ্যান্ জীবনসঙ্গিনী হয়েছে মিশেল দ্য নস্ত্রাদামুর। অ্যান্ বা মিশেল—কারোরই এটা প্রথম বিয়ে নয়। তেরো বছর আগে, ১৫৩৪ সালে, মিশেল বিয়ে করেছিল এক অসাধারণ সুন্দরী নারীকে। এজেন অঞ্চলে সে নারীর সঙ্গে পরিচয় মিশেলের। আর সেই সুন্দরী মিশেল নস্ত্রাদামুকে উপহার দিয়েছিল দুটি সন্তান: একটি ছেলে, একটি মেয়ে। কিন্তু দক্ষিণ ফ্রান্সের চিরন্তন অভিশাপ—প্লেগ—রেহাই দেয়নি নস্ত্রাদামুকে। মাত্র তিনটে বছর! এজেন অঞ্চলে মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে হাজির হল প্লেগ, ১৫৩৭ সালে। মিশেল তখন চিকিৎসক। প্লেগের বিরুদ্ধে ওর জীবনপণ সংগ্রাম। তবু, পারেনি মিশেল। সে যুদ্ধে জয়ী হয়েছে প্লেগ। ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ওর স্ত্রীকে, দুই সন্তানকে।

অ্যানের মুখে ব্যথার হাসি। মিশেল পারেনি তার প্রিয়াকে, সন্তানকে রক্ষা করতে। সেও কি পেরেছে তার স্বামীকে বাঁচাতে! অ্যান্‌কে সুখী করার জন্য কি না করেছে সেই ঝরে-যাওয়া যুবক! আজ সে মাটির গভীরে, কফিনের বিষণ্ন গণ্ডীতে হয়ত এক কঙ্কালে পরিণত। ব্যথাটা চিন্‌চিন করে অ্যানের বুকে—সেই যুবককে ও কোন বাসন্তী ফুল এনে দিতে পারেনি! সন্তান আসেনি ওদের। কফিনে শায়িত সেই যুবকের বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী আজ অ্যান্ একা।

চোখ তুলে মিশেলকে দেখল অ্যান্। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছে মিশেল। সারারাত জেগে ছিল মানুষটা। আজ ঠিক এক মাস এই চুয়াল্লিশ বছরের প্রৌঢ় মিশেল দ্য নস্ত্রাদামুর ঘরনী হয়েছে অ্যান্। অথচ কটা রাত তার কাছে কাটিয়েছে মিশেল? না, অ্যান্ আজ আর ফুটন্ত যৌবনের প্রতীক নয়।

যৌবনের বসন্ত তাকে বিদায় জানিয়েছে। তবু, বসন্তের পরেও তো গ্রীষ্ম আসে! কোনো-এক ছড়িয়ে-পড়া উষ্ণতা তো ফিরে-ফিরে আসে বারবার!

নেমে এসেছে নস্ত্রাদামু। রাত-জাগা চোখে স্ত্রীকে দেখছে। গত রাতে আগামী দিনের পৃথিবীর বুকে পা রেখে এসেছে মিশেল। আঁধারী ঘরে দেখেছে সেই পৃথিবীর উপড়ে-আনা হৃদপিণ্ড, শুকিয়ে-যাওয়া রক্তের কাল্‌চে ছাপ। এখন ভোর। সকালী বাতাস। শীত-ভাঙা সূর্য। ঘুমভাঙা ফ্রান্স। কোথাও পাখির ডাক। রাত শেষ। মানুষ জাগছে। জাগছে আজ। আজ, বর্তমান। কিন্তু, ভবিষ্যৎ আছে। সেই ভবিষ্যৎ। সে আসবে। এবং—সামনে দাঁড়িয়ে অ্যান্!

ঠোঁটের কোণে একটুকরো মিষ্টি হাসির ভাঁজ পড়ে মিশেলের। এগিয়ে এসে স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখে ও, 'এত ভোরে উঠলে কেন?'

এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবে অ্যান্? সারারাত যে ও-ও ঘুমোয়নি, তা এই খেয়ালী মানুষকে বলে লাভ কী? হাসে অ্যান্, 'হাত-মুখ ধুয়ে নাও, আমি চা করতে বলছি।'

দুপুরে, খাওয়ার টেবিলে বসে, কথা বলে মিশেল, 'অ্যান্, ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ বড় অন্ধকার। আমি বুঝতে পারছি।'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় অ্যান্, 'মানে?'

একটু একটু করে গত রাতের কথা বলে যায় নস্ত্রাদামু। শুনতে শুনতে শিউরে ওঠে অ্যান্। এ কোন্ মানুষ তার জীবনসঙ্গী হয়েছে? কোন্ রহস্যমাখা জগতের প্রতিনিধি তার স্বামী?

কথা শেষ করে প্রশ্ন করে নস্ত্রাদামু, 'বিশ্বাস হল না?'

বিব্রত বোধ করে অ্যান্, 'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা না। কিন্তু এগুলো যে মিলবে তার প্রমাণ কী?'

মাথা নাড়ে মিশেল, 'না মিললেই আমি খুশি হব অ্যান্। কিন্তু তা হবে না। আমার মন বলছে—সব মিলবে।'

এক অদ্ভুত অস্বস্তি সারাদিন কুরে কুরে খেলো অ্যান্‌কে। গত একটা মাসে ও অনেক ভেবেছে—সারারাত ঐ ছাদের ঘরে কী করে মিশেল? স্পষ্ট করে মিশেল কখনও কিছু বলেনি। কিছু কিছু আভাস দিয়েছে মাঝে-মধ্যে। কোনও এক রহস্যঘেরা আকর্ষণ আছে তার স্বামীর-এটুকু বুঝেছিল অ্যান্। কিন্তু, এই সে রহস্য? পৃথিবীর অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের শরীরে পা রাখছে তার স্বামী? রাতের প্রহরে কে এসে বসে মিশেলের পাশে? কার কণ্ঠস্বর শুনতে পায় ও? ঐ ট্রাইপড, জলের পাত্র, হালকা

আলোর রেখা—মাথার মধ্যে হাজারো উদ্বিগ্ন প্রশ্নের দোলা অ্যানের। কোথা থেকে ফুটে ওঠে শব্দের মিছিল?

রাতের বিছানায় একলা নস্ত্রাদামুর স্ত্রী। এক উত্তর-যুবতী। বসন্ত যার ফুরিয়েছে। আছে গ্রীষ্মের দাহ। জ্বালা। ঘরে বাতির আলো। ক্ষীণ আলোর সীমানায় উন্মুখ শয্যা। শয্যায় এক নারীর সিলুয়েট্ অবয়ব। স্থির শরীরের গভীরে তার অস্থির কামড়। শরীরের মধ্যে কী-যে থাকে! এক জলপ্রপাত। কিন্তু—সে আসে না। সে ছোট্ট ঘরের মাঝে পিতলের ট্রাইপড পেতে ....আহ্, গ্রীষ্ম....

'অ্যান্!'

বড় মৃদু, প্রায় ফিসফিস এক স্বর। কে ডাকে? গ্রীষ্মের দুয়ারে কার সাড়া? ওপরের ঘরে ঐ মানুষের সঙ্গে রাতে রাতে যে গুঞ্জন তোলে—সে?

বাতির আলোয় শয্যাপ্রান্তে এক বলিষ্ঠ পুরুষমূর্তি। এক খুশির ঝর্ণা অ্যানের দু'চোখে—মিশেল! মিশেল এসে দাঁড়িয়েছে শয্যাপ্রান্তে! তার রহস্যময় স্বামী।

'আজ এগারোই ডিসেম্বর অ্যান্। আজ যে আমাদের বিয়ের এক মাস পূর্ণ হল।' স্ত্রীর পাশে বসেছে মিশেল।

আহ্, ওর মনে আছে! ওর মনে আছে, আজ এক মাস! দুটো হাত সামনে বাড়িয়ে দেয় অ্যান্ নস্ত্রাদামু....

'আচ্ছা, এসব করার তোমার দরকারটা কী বলতে পারো? অর্থের কি আমাদের অভাব আছে?'

হাসল মিশেল, 'না, তা নেই। তবে কি জানো, কাজ-টাজ নিয়ে না থাকলে একেবারে কুঁড়ের বাদশা হয়ে উঠবো যে!'

—'তাই বলে ঐ-সব?' নানান ধরনের কস্‌মেটিক্‌স্‌গুলোর দিকে আঙুল দেখায় অ্যান্, 'কুঁড়ের বাদশা হওয়ার ইচ্ছে না থাকলে ডাক্তারিটাই তো করলে হয়।'

কস্‌মেটিক্‌সের ভীড় থেকে উঠে পড়ে নস্ত্রাদামু, 'আরে অন্য আরেকটা ফন্দি আছে মাথায়। চলো, চা খেতে খেতে বলছি।'

সালোঁতে তিনটে বছর কেটে গেছে মিশেলের। অ্যানের কোলে এখন দুটি সন্তান—সেজার আর আঁদ্রে। অর্থের অভাব অ্যানের নেই। কাজ মিশেলকে করতে হয় না। নেহাৎই খেয়ালের টানে নানান কস্‌মেটিক্‌স্ তৈরী করে ঘরে বসে। স্থানীয় বাজারে সেগুলো বিক্রিটিক্রিও হয়। চিকিৎসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে মিশেল।

চায়ের পেয়ালায় আরাম করে চুমুক দেয় নস্ত্রাদামু, 'বুঝলে, একটা পাঞ্জিকা বার করবো ভাবছি।'

'পঞ্জিকা? কী থাকবে তাতে?' রহস্যময় স্বামীটির বিচিত্র কাজকর্মকে আজও ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেনি অ্যান্।

'বুঝতে পারলে না? বর্ষপঞ্জী গো! ধরো, এই বছরের আবহাওয়ার খবরাখবর, শস্য-টস্য কেমন হবে, এখানকার হালচাল কেমন যাবে—এইসব থাকবে আর কি। লেখা আমার হয়েই গেছে। ছোট ছোট পদ্যে লিখেছি সবটা। তোমাকে দেখাবোখন।'

'তা, এসব ছাপতে তো অনেক অর্থ লাগবে।'

সশব্দে হেসে ওঠে মিশেল, 'তা কিছু লাগবে বটে। কিন্তু বিক্রি হলে নগদ কত ঘরে আসবে জানো?'

না, অ্যান্ জানে না। জানতে চায়ও না। তবু ওর শরীরে এক খুশির ঝিলিক—এই নতুন ঝোঁকে হয়ত ঐ রাতের একলা ঘরের দুর্নিবার নেশা কাটতে পারে! রাত, ছাদের সেই ঘর, একলা মিশেল, জলপাত্র....দুঃস্বপ্ন, অ্যানের দুঃস্বপ্ন!

রাতের নেশার কথা থাক। বর্ষপঞ্জী বার করল মিশেল নস্ত্রাদামু। প্রচণ্ড কাটতি হল পঞ্জিকার। চাহিদার তুলনায় পঞ্জিকার যোগান কম পড়ে গেল। প্রচুর অর্থ ঘরে তুলে নিল মিশেল। সেজার আর আঁদ্রের জন্যে নতুন একগাদা পোশাক কিনে মিশেল বাড়ি ফিরল।

এগিয়ে এল অ্যান্, 'আরে, করেছো কি? এইগুলো সব আঁদ্রের? না, আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়েছি যা-হোক। আঁদ্রের ক'মাস বয়স? এ-সব ওর গায়ে হয় কখনো? আর এইগুলো বুঝি সেজারের? তা, মন্দ হয়নি। তোমার মতো বয়সে এগুলো কাজে লাগবে ওর।'

মিশেল বেপরোয়া, 'রাখো রাখো! ওগুলো গায়ে না হলে আরও দু'ডজন নিয়ে আসবো, বুঝলে!'

আর, সেই রাতে, মিশেল নস্ত্রাদামু আবার পা রাখে ছাদের স্টাডিরুমে। ব্যথার কাঁপন চোখে নিয়ে তাকিয়ে থাকে অ্যান্: আশা ব্যর্থ। পঞ্জিকার সাফল্য রহস্যের রাস্তা থেকে সরাতে পারেনি মিশেলকে। অনেক বড় কোন নেশা অপেক্ষা করে আছে ছাদের ঐ ঘরে।

স্টাডি-রুমে একলা নস্ত্রাদামু।

সেই এক পিতলের ট্রাইপড, তার ওপরে জলের পাত্র, হাতে সেই সরু দণ্ড। অর এক আলোর ইশারা—হালকা, কোমল, ছড়িয়ে-ছড়িয়ে-পড়া

আলো।

জলের মাঝে ধোঁয়ার আভাস...

গা-সিরসির অনুভূতি, পার্থিব টান নেই কোন, পৃথিবীর সত্তা নয় ঐ ফরাসী!

এবং আলোর ঝিরিঝিরির গভীর থেকে উঠে আসে শব্দ, এক, একের পর আর এক, আবার ...এই বার—

মিশেল নস্ত্রাদামুর ঋজু অবয়ব কেঁপে উঠছে, অস্থির এক কাঁপন, ভয়ের ছোঁয়া—সেই কণ্ঠস্বর, হিমেল স্পর্শ! ফরাসীর পাশে এসে বসেছে কোন্ এক অচিন অস্তিত্ব। কী শুনছে নস্ত্রাদামু?

১৯৯৯ সাল আর সাত মাসের সময় আকাশ থেকে নেমে আসবে আতঙ্কের মহান রাজা। সে ফিরিয়ে আনবে মোঙ্গলদের মহান রাজাকে। তার আগে আর পরে—অবাধে আধিপত্য করবে যুদ্ধ।

এখানেই শেষ নয়। মিশেলের সামনে ভাসে—

মেষ, বৃহস্পতি আর শনির শীর্ষে: শাশ্বত ঐশ্বর্য কীসের পরিবর্তন ঘটাবেন? তারপর, এক দীর্ঘ শতাব্দী পরে ফিরে আসবে অশুভ সময়: ফ্রান্স আর ইতালিতে আসবে কোন্ সে আলোড়ন?

হিসেব মেলাচ্ছে এরিকা। নস্ত্রাদামুর হিসেব।

১৯৯৯ সাল আর সাত মাস। অর্থাৎ, **১৯৯৯-এর জুলাই। তার আগে-পরে—যুদ্ধ!** প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পেরিয়ে পৃথিবী এখন এক তৃতীয় যুদ্ধের আগ্নেয়গিরিতে দাঁড়িয়ে। অগ্ন্যুৎপাত শুরু হবে যে-কোন মুহূর্তে। ১৯৯৯-এর মধ্যেই তাহলে আসছে সে? আতঙ্কের মহান রাজা!

মিশেল দ্য নস্ত্রাদামু তিনজন খ্রীষ্ট-বিরোধীর কথা বলেছে বারবার। এরিকার হিসেবে—প্রথমজন নেপোলিয়ঁ, দ্বিতীয়জন হিট্‌লার। দুজনেই পৃথিবীটাকে টেনে নিয়ে গেছে যুদ্ধের আবর্তে। তৃতীয়জন আসবে। সেই অজানা তৃতীয়ই কি আতঙ্কের রাজা? তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বার্তাবহ?

মোঙ্গলদের মহান রাজার প্রত্যাবর্তন? বিষয়টা ধোঁয়াটে। মোঙ্গলদের এশিয় নৃপতি কি ক্ষমতায় আসবে? নস্ত্রাদামুর চতুষ্পদীগুলোর ভাষা প্রায়ই

কুয়াশা ছড়ায়। আসলে, মিশেল দ্য নস্ত্রাদামুর জীবন কেটেছে ইওরোপের সেই ইন্‌কুইজিশন্-এর যুগে। ধর্মের ওপর আঘাত হানার অজুহাতে বহুজনের ওপর নির্যাতনের রোলার চালিয়েছে চার্চ। সে আক্রমণের বিষাক্ত থাবা এড়াতে নস্ত্রাদামুকে ব্যবহার করতে হয়েছে প্রতীকী ভাষা, রহস্যময় ইঙ্গিত। চারশো বছর পরে, আজকের রোবট্-রকেটের সীমায় দাঁড়িয়ে, সে ভাষাকে বুঝে ওঠা সমস্যা বৈকি।

হিসেবের এখনও বাকি। বৃহস্পতি, শনি আর মেষের মধ্যে শেষ সংযোগ ঘটেছিল ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই ডিসেম্বর। জ্যোতির্বিদরা বলেছেন —পরবর্তী সংযোগ ঘটবে **১৯৯৫-এর ২ ডিসেম্বর। ফিরে আসবে অশুভ সময়, এক কালো যুগ।** ফ্রান্স, ইতালি হবে উত্তাল।

১৯৯৫, ১৯৯৯—নব্বই-এর দশক! এগিয়ে চলেছে পায়ে পায়ে, চুপিচুপি —নব্বই-এর দশক। ভবিষ্যদ্বক্তাদের রাজা বলেছে—এই সময়েই আমাদের গ্রহটা আবার মাতাল হবে যুদ্ধের নেশায়। ভুল হোক, মিথ্যা প্রমাণিত হোক নস্ত্রাদামু—এরিকার চোখে বুঝি বাদল মেঘের আনাগোনা।

৩

খুঁজে ফিরি সেই মানুষে

পটভূমি—ফ্রান্স।

আভিনোঁ অঞ্চলের প্রতিষ্ঠিত শস্যব্যবসায়ী পিয়ের দ্য নোৎরদেম্ জীবনসঙ্গিনী হিসেবে বেছে নিলেন ব্লাঁশেকে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পৃথিবীর আলো দেখল তাঁদের সন্তান—জ্যাকে। বড় হল জ্যাকে। আভিনোঁ ছেড়ে চলে এল সেন্ট রেমিতে। সময়টা ১৪৯৫ সাল। শস্যব্যবসা ছেড়ে অন্য কাজে হাত দিল ও। এই সময় তার জীবনেও এল এক নারী—রেনিয়ের। জ্যাকে-রেনিয়েরের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ফসল মাথা তুলল মাটির বুক চিরে—সেই মানুষ! সেই মানুষ, যাকে খুঁজে ফিরেছে এরিকা শিথ্যাম্।

মিশেল দ্য নোৎরদেম্। লাতিনিয় উচ্চারণ যাকে পরিচিত করেছে মিশেল দ্য নস্ত্রাদামু নামে। পুরনো জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী তার জন্মের তারিখ ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর, আর গ্রেগরিয়ান ক্যালেণ্ডার মতে ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ ডিসেম্বর। প্রভাঁস প্রদেশের সেন্ট রেমি জন্ম দিল "ভবিষ্যদ্বক্তাদের

রাজা''-কে।

বংশ-পরম্পরায় নস্ত্রাদামুরা ইহুদী ছিল। দ্বাদশ লুই ১৫০১ সালে ফরমান জারি করেন—তিন মাসের মধ্যে প্রত্যেক ইহুদীকে ক্যাথলিক মতবাদ গ্রহণ করে খ্রীশ্চিয়ান হতে হবে, অথবা চলে যেতে হবে প্রভাঁস ছেড়ে। জ্যাকে-রেনিয়েরে তখন গ্রহণ করেছিলেন খ্রীশ্চিয়ান ধর্ম। মিশেল দ্য নস্ত্রাদামুর পথ চলার হিসেব-নিকেশ করার সময় এই পশ্চাৎপটটা মনে রাখা একান্তই জরুরী। কেননা, দেখা গেছে, জ্যোতিষ-বিষয়ক ইহুদী রচনাগুলো পরবর্তীকালে স্পষ্ট ছাপ ফেলেছে নস্ত্রাদামুর চিন্তাভাবনায়।

জ্যাকে-রেনিয়েরের পাঁচটি সন্তান—মিশেল, বার্ট্রাণ্ড, হেক্‌তোর, আন্তোইন্ আর জাঁ। মিশেল সবার বড়। বয়সে, বুদ্ধিতে।

সেদিন বিকেলে ঘরে ফিরে রেনিয়েরকে ডাকল জ্যাকে, 'একবার এদিকে শুনে যাও'।

এগিয়ে এল রেনিয়ের, 'বলো'। জ্যাকের মুখের ভাঁজে ভাঁজে গভীর চিন্তার ঘন ছায়া। স্থির চোখে রেনিয়েরের দিকে তাকাল ও, 'বসো'।

বসল রেনিয়ের। কিছুটা যেন অবাক। কী বলবে জ্যাকে?

জ্যাকে কোন ভূমিকা করল না, 'মিশেলকে ভাবছি বাবার কাছে পাঠিয়ে দেবো।'

'কেন?' রেনিয়েরের গলায় উদ্বেগের ছোঁয়া। মিশেল তার প্রথম সন্তান। তাকে ছেড়ে থাকা তার পক্ষে খুব সুখকর নয়।

কথা বলল জ্যাকে, যেন অনেক দূর, অনেক গভীর থেকে, 'মিশেলের মধ্যে একটাকিছু আছে। ও ঠিক সাধারণ নয়। এখানের পরিবেশে ও তেমন সুযোগ পাবে না। বাবা অনেক বিষয় জানেন। আমার মনে হয় উনি মিশেলকে গড়ে-পিটে তুলতে পারবেন।'

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে রেনিয়ের। বুকের মাঝে কি এক উথাল-পাথাল দোলা। মিশেল...হ্যাঁ, ভুল বলেনি জ্যাকে। মিশেল ঠিক আর পাঁচটা ছেলের মত নয়। ওর চোখের গভীরে যেন কোন্ সুদূরের ঠিকানা, যেন এই ছোট্ট সেন্ট রেমির জল-হাওয়াটুকুর গণ্ডীর বাইরে কোনও ছায়াপথ অথবা নক্ষত্রলোকের বাসিন্দা ও। কিছু একটা আছে ওর মধ্যে। কিন্তু—কী? কী আছে তার প্রথম সন্তানের চেতনায়?

'তোমার আপত্তি নেই তো?'

চোখ তোলে মিশেলের মা। মনস্থির করে নিয়েছে ও। তার রক্ত-মাংসে গড়া প্রথম মানবশিশু মাথা তুলুক আলোর আকাশে।

‘না, আমার কোন আপত্তি নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে পাঠিয়ে দাও বাবার কাছে।’

ছোট্ট মিশেল চলে গেল ঠাকুর্দার কাছে।

বুড়ো ঠাকুর্দা নাতিকে কাছে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা। যাক, শেষ বয়েসটা তবু একটু জমিয়ে কাটানো যাবে!

তা, জমিয়েই বসলেন সেই বৃদ্ধ। নাতিকে নিয়ে বাগানে বসে একগাল হেসে, মাথা নেড়ে শুধোলেন, ‘আচ্ছা দাদুভাই, কোন্ কোন্ ব্যাপার তোমার জানতে ইচ্ছে করে বলো তো?’

মিশেল তো ঠাকুর্দার কথা শুনে হেসেই সারা, ‘কি যে বলো দাদু! আমার তো সব কিছুই জানতে ইচ্ছে করে।’

একটু থতিয়ে যান বৃদ্ধ নোৎরদেম্। সব কিছু? সব কিছু জানতে ইচ্ছে করে এই একরত্তি ছেলের? মাথার মধ্যে একরাশ খুশি আর যন্ত্রণার ঝিম্‌ঝিম্ বাজনা বাজে তাঁর। না, তাঁর সন্তান, এই মিশেলের বাবা, কোনদিন জানতে চাওয়ার পথে পা বাড়ায়নি। অথচ, তিনি নিজে শস্যের ব্যবসার ফাঁকে ফাঁকে, সারাক্ষণ হাঁটতে চেয়েছেন এই জানতে চাওয়ার মসৃণ, বিপজ্জনক ঢালে। বিপজ্জনক! নোৎরদেম্ জীবন দিয়ে জেনেছেন—অনেক কিছু জানতে-চাওয়া, জেনে-ফেলা, এ পৃথিবীতে বড় বিপজ্জনক। তবু, বড় সুখের, আনন্দের এক উষ্ণ বালাপোষও জড়িয়ে থাকে এই বিপজ্জনক বস্তুটার শরীরে।

নাতির কাঁধে হাত রেখে হাসেন বৃদ্ধ, ‘সব কিছু তো আমি জানি না দাদুভাই। তবে যতটুকু জানি, সব দিয়ে যাবো তোমাকে।’

শুরু হল ভবিষ্যতের এক কারিগর গড়ার কাজ। নাতিকে নিয়ে জমাট আসর পেতে বসলেন ঠাকুর্দা। লাতিন, গ্রীক আর হিব্রু ভাষার গভীরে পা ফেললো মিশেল—আগামী দিনে যে হয়ে উঠবে ‘ভবিষ্যদ্বক্তাদের রাজা’। সাদা পাতায় হাজারো সংখ্যার আতসবাজি ছড়িয়ে পৌত্রকে গণিত শেখাতে শুরু করলেন নোৎরদেম্। বিশ্বের কৌতূহল চোখে নিয়ে বালক শিখে চললো অঙ্কের সুন্দরতম সঙ্গীত। তার সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যা। সমবয়সী বালকদের কাছে যা এক চরম বিরক্তিকর ব্যাপার, মিশেলের কাছে তা যেন কবিতার লাবণ্য। চিরায়ত কোন কাব্যের মূর্ছনার মতো জ্যোতির্বিদ্যা ঝঙ্কার তুললো মিশেলের চেতনায়।

দিন ফুরলো। কোন এক ব্যাকুল-বাদল সাঁঝে মিলন-মেলা ভাঙলো অবশেষে। ঘরে ফিরে মিশেল দেখলো—ঠাকুর্দা শুয়ে আছেন টানটান হয়ে, দুটো চোখ আধ-বোজা, ঠোঁটের কোণে একটুকরো বিজয়ীর হাসি।

ঠাকুর্দা—নাড়ির স্পন্দন নেই, প্রশান্ত বুকে কোন ওঠা-নামা নেই, নিশ্চল, কোন সুদক্ষ ভাস্করের গড়া এক পাথুরে মূর্তি যেন। পাথরে কি ফুল ফোটে? স্থির, নিষ্কম্প দৃষ্টিতে ঠাকুর্দার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো ভবিষ্যতের নস্ত্রাদামু। চোখে ওর জল ছিল না সেদিন। শুধু শরীরের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে এক রিন্‌রিন্‌ বাজনা, আর বুকের গভীর থেকে গভীরতম উচ্চারণ, 'আমি রইলাম। পাথরে ফুল ফোটানোর জন্যে আমি রইলাম।'

ঘরে ফেরা। বাবা-মার কাছে, ভাইদের মধ্যে, ফিরে এল মিশেল। ছোট্ট জাঁ তো খুব খুশি।

সবাই খুশি, শুধু মনের মধ্যে কালো মেঘের আনাগোনা রেনিয়েরের। ছেলে যেন আরও বদলে গেছে, চোখে-মুখে সারাক্ষণ কিসের যেন ঝলক। আড়াল-আবডাল থেকে মিশেলকে লক্ষ্য করে রেনিয়ের। কী এক আশঙ্কায় বুক কাঁপে মায়ের। রাতের অন্ধকারে শরীর মিশিয়ে মিশেল মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে কালচে আকাশের জমিনে ছড়িয়ে থাকা হীরেদানার মতো নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায় তার চোখ। কী খোঁজে ঐটুকু ছেলে? বন্ধু-বান্ধবরা বলে মিশেল আমাদের খুদে জ্যোতিষী।

তো, একদিন সূর্য-ধোয়া দুপুরে, এই খুদে জ্যোতিষী তার সঙ্গীসাথীদের শুধোল, 'আচ্ছা, ঐ সূর্যটা পৃথিবীর চারধারে ঘুরপাক খাচ্ছে, না রে?'

বন্ধুরা হেসেই সারা, 'সে আর বলতে! একথা তো সবাই জানে। সূর্যটা একেবারে বন্‌বন্‌ বন্‌বন্‌ করে...'

হাতের ইশারায় বন্ধুদের থামিয়ে দেয় মিশেল, 'থাম্‌। শুনে রাখ, কথাটা ডাহা মিথ্যে। সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে না, ঘোরে আমাদের এই গ্রহটাই। এই পৃথিবীটা গোল, আর এটা পাক খায় ঐ সূর্যটার চারপাশে।'

খুদে জ্যোতিষীটা বলে কী? কিশোর সাথীদের মুখগুলো নীল হয়ে উঠলো আতঙ্কে। একি সর্বনেশে কথা শোনাচ্ছে মিশেল? এ যে চার্চবিরোধী কথা! হ্যাঁ কোথায় যেন কোপার্নিকাস বলে একটা লোক এইসব কথা বলছে-টলছে বটে (মনে রাখা দরকার নিকোলাস কোপার্নিকাসের De revolutionebus orbium caelestium বা On the Revolutions of the Celestial Spheres গ্রন্থটি তখনও প্রকাশিত হয়নি। গ্রন্থ প্রকাশ হবে ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে, যে বছর মারা যাবেন কোপার্নিকাস)। কিন্তু চার্চ তো তাকেও ছাড়বে না।

বন্ধুদের চোখে আতঙ্ক আর অবিশ্বাসের ছায়া, 'কী সব যা-তা বকছিস মিশেল?'

কিশোর মিশেল নির্বিকার, 'ঠিকই বলছি। জ্যোতির্বিজ্ঞান আর অঙ্ক তো

তাই-ই বলছে। আজই হয়ত কেউ একথা মানবে না। কিন্তু একদিন-না-একদিন সবাইকেই এটা মেনে নিতে হবে।' (আবারও মনে রাখা দরকার—মিশেল নস্ত্রাদামুর জীবনের এই সময়কার প্রায় একশো বছর পরে, সপ্তদশ শতাব্দীতে, এই একই বিশ্বাস আর তা প্রমাণ করার চেষ্টার 'অপরাধে' অভিযুক্ত হবেন গ্যালিলিও গ্যালিলি।)

মারাত্মক কথা। সঙ্গী-সাথীরা এদিক-সেদিক করে সরে পড়ল। নিজের মনেই হাসল মিশেল — মূর্খের দল!

কথাটা মুখে-মুখে রটলো কিছুটা। শোনা গেল, ঐ ফচ্‌কে ছোঁড়াটা বলছে পৃথিবী নাকি সূর্যের চারপাশে পাক খায়!

জ্যাকে নিভৃতে ডাকল রেনিয়েরকে, 'শুনেছো?'

রেনিয়ের আতঙ্কে বিবর্ণ, 'শুনেছি?'

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চোখ মেললো জ্যাকে, 'এ-সব কথা ওর মাথায় কী করে ঢুকলো, কে জানে! চার্চ তো ছাড়বে না। যত্রতত্র ইন্‌কুইজিশন চলছে। এ অবস্থায়—'

রেনিয়েরের মাথায় রয়েছে আরও সাঙ্ঘাতিক একটা কথা। ফিসফিস করে উচ্চারণ করল ও, 'তার ওপর...তার ওপর আমরা আগে ইহুদী ছিলাম!'

চমকে ওঠে জ্যাকে। তাইতো! এ কথাটা তো মনে পড়েনি ওর। নোৎরদেম্‌ পরিবার ইহুদী থেকে ক্রীশ্চিয়ান হয়েছিল। ফলে, চার্চের খড়্গ তাদের ওপর এসে পড়া একান্তই স্বাভাবিক। তাহলে?

এবার প্রস্তাবটা এল রেনিয়েরেরই কাছ থেকে, 'আমি বলি কি, ওকে আবার বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দাও। সেখানে থেকেই পড়াশোনা করুক ও।'

চোখ তুলে জীবসঙ্গিনীকে দেখে জ্যাকে। অনেক ব্যথা, অনেক জমে থাকা জল জ্যাকের চোখের জমিতে, 'তাই হোক।'

সালটা ১৫২২, উনিশ বছরের তরুণ মিশেল আবার চলল বাবা-মাকে ছেড়ে, জীবনের পথে।

মঁপেলিয়ে ইউনিভার্সিটি। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে নস্ত্রাদামু পা রাখল মঁপেলিয়েতে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জগতে এ ইউনিভার্সিটির তখন রমরমা অবস্থা। সেই ১৩৭৬ সাল থেকে প্রতি বছর একজন অপরাধীর মৃতদেহ পেয়ে আসছে মঁপেলিয়ে—কেটে-ছিঁড়ে দেখার জন্য।

উনিশ থেকে বাইশ—তিনটে বছর, শীত-বসন্ত-বর্ষা, পার হল মিশেল।

মঁপেলিয়েতে তখন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কিছু চিকিৎসা-বিজ্ঞানী অধ্যাপনা করতেন। তাঁদের সহায়তায় তিন বছর অনেক যোজন পেরিয়ে গেল মিশেল। ব্যাচেলর্স ডিগ্রী পেতে অসুবিধে হল না। চিকিৎসক হিসেবে প্র্যাকটিস করার লাইসেন্স মিলল ১৫২৫ সালে।

রাত নামছে।

ঝিম্‌ঝিম্‌ নেশামাখা রাত। জানলার ফাঁকে আকাশের টুকরো। আর এই ঘরে এক আলো, তার সামনে ঝুঁকে-পড়া এক যুবকের অবয়ব। কাগজের বুকে কি সব লিখছে ঐ যুবক।

মিশেল নস্ত্রাদামু। বড় ক্লান্ত আজ ও। একের পর এক অঞ্চলে ঝড়ের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে মিশেল। দক্ষিণ ফ্রান্সে বহুদিনের আতঙ্ক প্লেগ। এ বছরও হানা দিয়েছে এই অবাঞ্ছিত অতিথি। দক্ষিণ ফ্রান্সের কোণে কোণে মানুষের বুক-ভাসানো হাহাকার। ঘুরে বেড়াচ্ছে মিশেল। মানুষ, অসহায় মানুষ! অন্ধকারকে অভিশাপ না দিয়ে, একটা বাতি জ্বালানোই দরকার। মিশেল নস্ত্রাদামুর হাতে এক ছোট্ট বাতি, জ্বলন্ত—তার চিকিৎসা-বিজ্ঞান। প্লেগের বিরুদ্ধে নিজেও কিছু পদ্ধতি বার করেছে ও। সবটুকু সম্বল নিয়ে ছুটে যাচ্ছে মানুষের পাশে।

তুলো—র‍্যু দ লা ত্রিপেরি। ঝিমঝিম্‌ রাতে নিঃসঙ্গ এক যুবক। অচেনা এক অস্থিরতা ওর শরীরে। আকাশের দিকে তাকালে, গমের অথবা হীরেদানার মত ছড়িয়ে-থাকা নক্ষত্রপুঞ্জের অবয়বে, কী যেন চোখে পড়ে। কী...বড় অস্থির হয়ে ওঠে যুবক। কী সব কথা, যেন কিসের ঠিকানা, ভবিষ্যৎ, বহু বহু শতাব্দী, যেখানে পৃথিবী আরো প্রবীণ হয়ে যায় মিরুজিন নদীটির তীরে, বিবর্ণ প্রাসাদ...

সেদিন সেই অস্থির যুবকের ঘুম নামেনি চোখের পাতায়। রাতজাগা শরীর নিয়ে পরদিন সে চলেছে বোর্দু: প্লেগের বিরুদ্ধে তার লড়াই। সেখান থেকে আভিনোঁ।

অস্থিরতা বাড়ছে মিশেলের...

৪
পৃথিবীর পথে

আভিনোঁ। হেঁটে চলেছে অস্থির এক যুবক।

হেঁটে চলেছে মিশেল দ্য নস্ত্রাদামু।

অস্থির নস্ত্রাদামু। আভিনোঁর লাইব্রেরীটা আরও অস্থির করে তুলেছে ওকে। ঐ লাইব্রেরীর ধুলো-পড়া তাকে ও পেয়েছে জ্যোতিষ আর অতিপ্রাকৃত বিষয়ে বেশ কিছু বই। পড়ে ফেলেছে বইগুলো। বেড়েছে অস্থিরতা। কী একটা যেন দেখতে পাচ্ছে ও।

আভিনোঁর এই সময়টুকু মিশেল নস্ত্রাদামুর জীবনের একটা সন্ধিক্ষণ। ভবিষ্যতে সে যা হয়ে উঠবে, তার সূচনা আসলে এখানেই, আভিনোঁর লাইব্রেরীতে।

বড় একলা মিশেল। মা-বাবা কাছে নেই, ভাইরা সেই কোথায়! মাঝে মাঝে বিষণ্ণতা ছেয়ে ফেলে ওকে। এত বড় এক গ্রহ, এ গ্রহে কত সহস্র রঙের খেলা, হাজারো গান, আর প্রাণ, কত কত প্রাণ, প্রাণের ফোয়ারা—অথচ, আমি যে একা। জীবনের সাথী নেই, চিন্তার সাথী নেই।

আভিনোঁ থেকে মঁপেলিয়ে, সেখান থেকে বোর্দু, বোর্দু পেরিয়ে লা রশেল্, তুলো। মিশেল নস্ত্রাদামু চিকিৎসক হয়ে উঠেছে।

'এসো হে, আমার এজেন্-এর বাড়িতে কটা দিন কাটিয়ে যাও—' ডাক পাঠিয়েছেন দার্শনিক জুলিয়াস সেজার স্ক্যালিজার। ষোড়শ শতাব্দীর সুবিখ্যাত দার্শনিক।

এজেন্। নস্ত্রাদামু। এবং...

এবং সেই নারী। মিশেলের জীবনের প্রথম নারী। সময়টা ১৫৩৪-এর কাছাকাছি।

সেই নারীকে প্রথম দিন দেখে স্থির হয়ে গিয়েছিল মিশেল। কে এ? চলনে-বলনে সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব, শরীরে আভিজাত্যের ছাপ, মুখের আদলে সারা ফ্রান্সের সৌন্দর্য। ফেরার পথ ছিল না মিশেলের।

আলাপ হল স্ক্যালিজার-এর বাড়িতে। সেদিন সন্ধ্যায় নিজের বাড়িতে ছোট্ট এক চা-চক্রের আয়োজন করেছিলেন দার্শনিক। চা-টা গৌণ, মুখ্য উদ্দেশ্য দার্শনিক আলোচনা। স্ক্যালিজারের অতিথি মিশেল হাজির। পায়ে পায়ে এসে পড়লেন অভ্যাগতরা।

আর এল সেই নারী। চমকে উঠেছিল মিশেল। এ এখানে? জটিল এই দার্শনিক আলোচনায় এ মেয়ে আমন্ত্রিত? স্ক্যালিজারের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে হেসে আসন নিল সেই মেয়ে।

স্ক্যালিজার শুধু দার্শনিকই নন। অজস্র বিষয়ে তাঁর কৌতূহল—চিকিৎসাশাস্ত্র, উদ্ভিদবিদ্যা, গণিত, এমন কি কাব্যেও। চা-এর ফাঁকে ফাঁকে, শুরু হল বহুমুখী আলোচনা।

প্রশ্ন তুললেন স্ক্যালিজার, 'আচ্ছা, আপনাদের কী ধারণা, কাব্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের তফাতটা কোথায়?'

বড় জটিল প্রশ্ন। এর উত্তর প্রাচীনকালেও খুঁজেছে মানুষ, ভবিষ্যতেও খুঁজবে। সকলে চুপ। কথা বলল মিশেল, 'মূলগতভাবে দুটোর মধ্যে কোন তফাত নেই। তফাতটা রূপের।'

'মানে?' প্রশ্ন—সেই নারীর।

কাঁপন লাগে নস্ত্রাদামুর বুকে, 'মানে, দুটোই এই পৃথিবী, মানুষ, প্রকৃতি নিয়েই কাজ করে। বিজ্ঞান তাকে সামনে আনে যুক্তির বাঁধনে, আর কাব্য পা ফেলে অনুভূতির আঙিনায়।'

স্ক্যালিজার খুশি নন, 'না বাপু, এ ঠিক ব্যাখ্যা হল না। আর, কাব্যের তুমি বোঝোটাই বা কী?' এটা দার্শনিক স্ক্যালিজারের স্বভাব। বহুজনের সঙ্গে তিনি ঝগড়া বাধান। প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে। এই স্বভাবের জন্য আজ পর্যন্ত কতজনের সঙ্গে, কত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে যে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু মিশেল রাগলো না। সুখের হাসি ওর ঠোঁটে। সুখ, কেননা সেই আশ্চর্য নারীর দুটি চোখ ওর মুখে স্থির, সে চোখে মুগ্ধতার গভীর ছায়া, শ্রদ্ধা। মিশেল জয়ী। একলা মিশেল আজ আর একলা নয়!

সেই নারী দেখছে মিশেলকে: মাঝারী উচ্চতা, মজবুত চেহারা, চওড়া কপাল, টিকালো নাক, ধূসর চোখ, লম্বা, ঘন দাড়ি—সব মিলিয়ে এক উজ্জ্বল যুবক।

সে এল নস্ত্রাদামুর জীবনে। অশান্ত, অস্থির নাস্ত্রদামু তখন প্রশান্তির স্বাদ পেয়েছিল জীবনে, দেখেছিল সন্তানের মুখ—একটি ছেলে, একটি মেয়ে। চিকিৎসার পেশায় তখন খ্যাতিও পেয়েছে ও, এসেছে সচ্ছলতা। পাশে স্ক্যালিজার, নানান মননশীল মানুষ আর ঐ তীক্ষ্ণধী নারী: বুদ্ধিমত্তায় ঝকঝকে হয়ে উঠেছে ও।

শেষ কথাটা তো আগেই বলা হয়ে গেছে: প্লেগ! মাত্র তিনটে বছর। প্লেগ এলো ১৫৩৭ সালে, চিকিৎসক মিশেলের প্রতিরোধের বেড়া ভেঙে

হাত ধরল তার স্ত্রীর, দুই সন্তানের। প্লেগের হাত ধরে পায়ে পায়ে চলে গেল ওরা। মিশেল দ্য নস্ত্রাদামু আবার একলা হল পৃথিবীর পথে। সহসা উজান জলে ভাটা গেল ভাসি,...বনের ছায়ার নিচে ভাসে কার ভিজে চোখ/কাঁদে কার বারোঁয়ার বাঁশি!

কিন্তু, বিপর্যয় কখনও একা আসে না। নস্ত্রাদামুর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল ধর্মবিশ্বাসকে হেয় করার।

কেন?

বছর কয়েক আগের ঘটনা। পথচল্‌তি নস্ত্রাদামুর চোখ আটকে গিয়েছিল একটা মূর্তির ওপর—ভার্জিন মেরী। কাজ তখনও শেষ হয়নি মূর্তিটার। সূক্ষ্ম কাজগুলোয় হাত দিয়েছে শিল্পী।

কিন্তু শিল্পীর সূক্ষ্ম কাজ দেখার জন্য নয়, মিশেল দাঁড়িয়েছে অন্য কারণে। ঐটা ভার্জিন মেরীর মূর্তি? এতটুকু শৈল্পিক বোধ নেই, মেরীর সেই আশ্চর্য কমনীয়তা নেই— কী হচ্ছে ওটা?

কয়েক পা এগিয়ে গেল মিশেল, 'এই যে শুনছেন?'

চোখ ফেরাল কারিগর, 'কী চাই?'

'না চাই না কিছু। শুধু জানতে চাই মূর্তিটা কার?'

ক্ষুব্ধ হয় কারিগর, 'দেখতে পাচ্ছেন না? এটা ভার্জিন মেরীর মূর্তি।'

একান্ত নিরীহ মুখে জবাব দেয় মিশেল, 'ও, আমি ভাবলুম বুঝি একটা শয়তানের মূর্তি গড়ছেন।'

বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়ায় কারিগর, 'কী বললেন?'

মিশেল গম্ভীর হয়ে যায়, 'বলছিলুম এ মূর্তিটার কোথাও কোন শৈল্পিক ছোঁয়া নেই। একটা সাদামাটা মূর্তি বানিয়েছেন আপনি, ভার্জিন মেরীর লাবণ্যের ছিটেফোঁটাও আনতে পারেননি।'

চলে গিয়েছিল ও। আগুনঝরা চোখে ওর দিকে তাকিয়েছিল সেই কারিগর। তারপর ঘাড় নেড়েছিল—আচ্ছা দেখা যাবে!

এতদিন পরে—সত্যিই দেখা গেল। অভিযোগ উঠল—ভার্জিন মেরীকে শয়তান বলেছে মিশেল নস্ত্রাদামু। জঘন্য অপরাধ। ধর্মবিশ্বাসের ওপর কুৎসিত আক্রমণ।

মিশেলকে ডেকে পাঠানো হল তুলোতে: বিচার হবে ইন্‌কুইজিশন। নেমে এসেছে ধর্মের গিলোটিন।

সময়টা ১৫৩৮ সাল। তুলোতে গেল না মিশেল। জীবনটাকে এভাবে খরচ করতে সে রাজি নয়। চার্চের বিষনখ এড়াতে অনির্দিষ্টের পথে নাও

বাইলো ও।

পলাতক নস্ত্রাদামু। এখান-ওখান করে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে ওকে। কোন জায়গাতেই বেশিদিন থাকা নিরাপদ নয়। চার্চের কাছে খবর পৌঁছলে রেহাই মিলবে না। অনির্দিষ্ট যাত্রা—কখনও লোরেন, কখনও ভেনিস, হয়ত বা সিসিলি।

জ্যোতিষ, অতিপ্রাকৃত সম্বন্ধে কৌতূহল দিনে দিনে বেড়েছে মিশেলের। আভিনোঁর লাইব্রেরীতে যার শুরু, মিশেলের সারা জীবন জুড়ে তার ছাপ। ফেরারী জীবন আরও এগিয়ে দিল ওকে। পড়ায়, ভাবনায় গড়ে উঠল এক ভবিষ্যদ্বক্তা।

গোপনে, নিজের পরিচয় লুকিয়ে ও দেখা করল বহু জ্যোতির্বিদের সঙ্গে, ইহুদী পণ্ডিতদের সঙ্গে। ফিলিপ্পাস্-এর লেখা 'হোরাস্ অ্যাপোলো' বইটা অনুবাদ করতে শুরু করল গ্রীক থেকে ফরাসী ভাষায়।

এইখানে এসে একটা গল্প বলা দরকার। হয়ত নিছক গল্পই। নস্ত্রাদামুর পরবর্তী খ্যাতির দরুনই হয়ত এ-ধরনের গল্প ছড়িয়ে পড়েছিল। তবু, তার খ্যাতির উচ্চতাটুকু বোঝার জন্যও, এগুলো জানা দরকার।

ইতালি।

রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে মিশেল নস্ত্রাদামু। মাথায় অনেক চিন্তা। কোথায় স্বদেশ, আত্মীয়-পরিজন, স্বপ্নময় শৈশব! কফিনে শায়িতা স্ত্রী, দুই সন্তান! ফেরারী জীবন। ফেরার ছেলে ঘরে ফিরবে কবে? এ বোঝা টানার দিন কবে শেষ হবে?

ঠিক তখনই রাস্তার বিপরীত দিক থেকে এগিয়ে আসছে এক তরুণ মঙ্ক—ফেলিস পেরেত্তি। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ফেলিস ছিল শূকর-পালক। মনের পথবদল তাকে মঙ্ক করে তুলেছে। নেহাতই তরুণ।

আনমনে এগিয়ে এসেছে ফেলিস। সামনে জমে আছে কিছুটা কাদা। বৃষ্টি হয়ে গেছে। সামনে একটা লোক, পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। চোখ তুলে লোকটাকে দেখল ও।

ঠিক তখনই চোখ তুলল মিশেলও। মুহূর্তে ওর শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। কে? কে এই মঙ্ক? এই তরুণের সর্বাঙ্গে কিসের ইঙ্গিত? ফেলিস কিছু বুঝে ওঠার আগেই কাদার ওপর নতজানু হয়ে বসল মিশেল। সশ্রদ্ধ কণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'ইয়োর হোলিনেস্!'

বিস্মিত ফেলিসের মুখে কথা ফোটেনি। লোকটা পাগল নাকি? ইয়োর হোলিনেস? অর্থাৎ, পোপ? একজন সামান্য মঙ্ক, অতীত যার শূকর-পালন,

তাকে এ নামে কে ডাকে?

উত্তর সেদিন মেলেনি। মিলেছিল প্রায় চল্লিশ বছর পরে। নস্ত্রাদামুর মৃতদেহ তখন পৃথিবীর অনেক গভীরে। সালটা ১৫৮৫, ফেলিস পেরেত্তি উঠে এসেছিল ঐ সর্ব্বোচ্চ পদে!

হয়ত গল্পই। নস্ত্রাদামুর পরবর্তী খ্যাতিই হয়ত জন্ম দিয়েছে এইসব অতিকথার। তবু, এমনটাই তো ঘটে। শক্তিমানের শক্তি নিয়ে কথা ফেরে মানুষের মুখে মুখে। আর, এই প্রক্রিয়াতেই, সেই কাঠামোর ওপরে পড়ে রঙের প্রলেপ। হরেক রঙে সেজে ওঠে ছোট্ট কোন ঘটনা। পৃথিবীতে এ ব্যাপার বারবার ঘটেছে। ঘটবেও।

থাক। অতিকথা ছেড়ে, মিশেল দ্য নস্ত্রাদামুর এমন কিছু ভবিষ্যৎ-কথনের দিকে চোখ মেলা যাক, যা স্পষ্ট হয়েছে বাস্তবে।

৫

ফেলে-আসা কথার মেলায়

চোখ মেলি অতীতে।

যাচাই করা যাক নস্ত্রাদামুর সেইসব ভবিষ্যদ্বাণীকে, যেগুলো অতীতের নানান ঘটনায় মিলে গেছে। হ্যাঁ, চতুষ্পদীগুলোকে যেভাবে দেখেছে এরিকা শিথ্যাম্—সেভাবেই দেখবো আমরা।

> **রাত্রিবেলা মানুষ ভাববে তারা এক সূর্য দেখেছে, আর তারা দেখবে এক অর্ধ-বরাহ মানুষকে। চিৎকার, আর্তনাদ, আকাশে দেখা যাবে যুদ্ধ। কথা বলবে বর্বর পশুরা।**

বিংশ শতাব্দীর নব্বই-এর দশকের পাঠকের কাছে চিত্রটা খুব অপরিচিত লাগছে কি? রাত্রিবেলায় সূর্য—নানান মারণ-বোমার ছবি সহজেই ভেসে ওঠে চোখের সামনে। পারমাণবিক বোমার প্রথম পরীক্ষার সময় গীতার শ্লোক আউড়েছিল ওপেন্‌হাইমার, 'হাজার সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল —ব্রাইটার

দ্যান এ থাউজ্যাণ্ড সান্‌স্!’ অর্ধ-বরাহ মানুষ? অক্সিজেন মুখোশ, হেল্‌মেট আর গগল্‌স্ পরিহিত কোন পাইলটের ছবিটা ভাবুন। মুখোশটা দারুণভাবেই এক শূকরের মুখ হাজির করে! আর, চারশ বছর আগে নস্ত্রাদামু লিখেছেন—যুদ্ধ হবে আকাশে! মাটি থেকে সে যুদ্ধ দেখবে মানুষ। বর্বর পশুদের কথা বলার অর্থ কী? আকাশে যুদ্ধরত বর্বর পশু যদি উড়োজাহাজ হয়, তাহলে তাদের কথা বলা হয়ত বেতার যোগাযোগেরই ইঙ্গিত।

মহামারীর অবসান হবে, ছোট হয়ে যাবে পৃথিবী, দীর্ঘদিন বজায় থাকবে শান্তি। মানুষ নিরাপদে পাড়ি জমাবে আকাশে, মাটির ওপর দিয়ে, এবং সমুদ্রে; তারপর আবার শুরু হবে যুদ্ধ।

শূন্যপথে যাতায়াত গোটা পৃথিবীকে নিয়ে এসেছে হাতের মুঠোয়, ‘ছোট’ হয়ে গেছে পৃথিবী—একান্তই বিংশ শতাব্দীর এই চিত্রটা স্পষ্ট হয়েছে নস্ত্রাদামুর লেখায়। এই শতাব্দীর তথাকথিত দীর্ঘতম শান্তির যুগ শুরু হয়েছে ১৯৪৫ থেকে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর পৃথিবী কোন বড় যুদ্ধ দেখেনি। মহামারীর অবসান হয়েছে অনেকটা, কিন্তু পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষ নিয়ে এসেছে অন্য ধরনের মহামারী। নস্ত্রাদামুর কথায় বিশ্বাস রাখলে মানতে হয়—শান্তির যুগ শেষ হয়ে এসেছে। যুদ্ধ আসছে দুঃস্বপ্নের মোড়কে জড়ানো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ! ইরাক-আমেরিকা যুদ্ধ কি তারই পূর্বসঙ্কেত?

আরও পিছনে যাওয়া যাক। অষ্টাদশ শতাব্দীর কথা। অর্থাৎ, মিশেল দ্য নস্ত্রাদামুর সময়ের থেকে দুশো বছরেরও পরের ঘটনা। নস্ত্রাদামু লিখেছেন—

নিশাকালে রেইন্-এর অরণ্য থেকে ঘুরপথে বেরিয়ে আসবে এক যুগল—রানী, শ্বেতপ্রস্তর। ভ্যারেন্‌স্-এ ধূসর পোশাক পরিহিত ভিক্ষুরাজা, নির্বাচিত ক্যাপেৎ প্রচণ্ড ঝড়, অগ্নিকাণ্ড আর রক্তমাখা ধারালো অস্ত্রকে ডেকে আনবে।

এ চতুষ্পদী অবধারিতভাবেই মনে পড়ায় ফ্রান্সের ষোড়শ লুই আর তার স্ত্রী মেরী আঁতোয়ানেৎ-এর কথা। তুইলারি থেকে পালিয়ে লুই আঁতোয়ানেৎ রেইন্-এর অরণ্যের মধ্যেই পথ খুঁজেছিলেন। অরণ্যের মাঝে পথের দিশা হারিয়ে ঘুরপথে যেতে হয়েছিল তাঁদের। শ্বেত প্রস্তরের দুটি অর্থ হতে পারে।

সেই 'হীরের নেক্‌লেস', যা মানুষের কাছে রানীর যাবতীয় মর্যাদাকে ধ্বংস করেছিল; অথবা, ধরা পড়ার পর রানীর রাতারাতি সাদা হয়ে যাওয়া চুল। তা ছাড়াও, জানা যায়, মেরী আঁতোয়ানেৎ সর্বদাই সাদা পোশাক পরতেন। ভ্যারেন্‌স্‌-এ প্রবেশ করার সময় ষোড়শ লুই-এর পরনে ধূসর বর্ণের পোশাকই ছিল। ক্যাপেৎ, অর্থাৎ নির্বাচিত রাজা। ফ্রান্সের প্রথম নির্বাচিত রাজা ষোড়শ লুই। ঝড় : ফরাসী বিপ্লব। ষোড়শ লুই ফরাসী বিপ্লবের কারণ ও শিকার, দুই-ই। রক্তমাখা ধারালো অস্ত্র একটা ছবিই তুলে ধরে—ভয়ঙ্কর গিলোটিন! লুই-আঁতোয়ানেৎ প্রসঙ্গে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ চতুষ্পদীর খোঁজ মেলে নস্ত্রাদামুর গ্রন্থে:

একাকী, অথচ বিবাহিত মানুষটিকে পরানো হবে একটি টুপি; যুদ্ধে জর্জর প্রত্যাবর্তনের পথে, তিনি যাবেন তুইলারির মধ্যে দিয়ে। পাঁচশত জনের দ্বারা মহত্ত্ব পাবে এক বিশ্বাসঘাতক। নরবোন্‌ এবং সল্‌স্‌—ছুরির বদলে আমরা পাবো তেল।

চতুষ্পদীটি নস্ত্রাদামুর সব থেকে উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণীগুলির অন্যতম। ষোড়শ লুই ও মেরী আঁতোয়ানেৎ, ভ্যারেন্‌স্‌-এ রাত কাটিয়েছেন সল্‌স্‌ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে এই পরিবার তেল আর মশলার কারবারী। তুইলারি এবং টুপি পরানো বড় চমকপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণী। ১৭৯২ সালের ২০ জুন ষোড়শ লুই তুইলারিতে ফেরেন। জনতা প্রাসাদ আক্রমণ করে। রাজাকে তারা বাধ্য করে মুক্তির বিপ্লবী টুপি মাথায় দিতে। ইতিহাস বলে—তুইলারি প্রাসাদে ফিরে আসার সময় জনতা সংখ্যায় ছিল পাঁচশজন।

নেপোলিয়ঁ বোনাপার্ট নস্ত্রাদামুর চোখে প্রথম খ্রীষ্ট-বিরোধী। নেপোলিয়ঁ প্রসঙ্গে দুটি ভবিষ্যদ্বাণী আগেই উল্লিখিত হয়েছে। এখানে আরও একটা চতুষ্পদী পরীক্ষা করা যাক।

শীঘ্রই মহান সাম্রাজ্যের সঙ্গে বিনিময় ঘটবে একটা ছোট্ট স্থানের, যে স্থান শীঘ্রই উন্নত হতে শুরু করবে। ছোট্ট এলাকাবিশিষ্ট আরও এক ক্ষুদ্রতর স্থান, যার মাঝখানে সে পরিত্যাগ করবে তার রাজদণ্ড।

ছোট্ট দ্বীপ এলবার সঙ্গে বিনিময় ঘটেছিল ফরাসী সাম্রাজ্যের। তারপর নেপোলিয়ঁর পলায়ন, বিজয়ের সেই ১০০ দিন। আবার তাঁর সাম্রাজ্য উন্নত হতে, বেড়ে উঠতে শুরু করে। কিন্তু দ্বিতীয়বার পরাজয়ের পর, তাঁকে নির্বাসন দেওয়া হয় আরও ছোট সেন্ট হেলেনা দ্বীপে। এখানেই রাজদণ্ড পরিত্যাগ করতে হয় তাঁকে।

ইংল্যাণ্ডের দিকে তাকানো যাক। নস্ত্রাদামু ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তাঁর সময় থেকে প্রায় একশ বছর পরের ইংল্যাণ্ড সম্বন্ধে।

টেম্‌স্ নদীর কাছের দুর্গটির পতন হবে যখন এক আক্রমণের পর রাজা বন্দী হবেন ঐ দুর্গের ভিতরে। নিজের জামা পরা অবস্থায় তাঁকে দেখা যাবে সেতুর কাছাকাছি, মৃত্যুর ঠিক আগে, তারপর মিলিয়ে যাবেন দুর্গের ভিতরে।

১৬৪৮ সালের ডিসেম্বর মাস। রাজা প্রথম চার্লস পরাজিত, বন্দী। পার্লামেন্টারিয়ানরা তাঁকে বন্দী করে রাখল টেম্‌স্ নদীর তীরে উইন্ডসর ক্যাস্‌ল্-এ। ১৬৪৯ সালের ৩০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল বিচার। বধ্যভূমির দিকে যাওয়ার সময় চার্লসের পরনে ছিল সাদা জামা।

প্রসঙ্গ পাল্টানো যাক। যুদ্ধ-মৃত্যু-রাজারাজড়া নয়—লুই পাস্তুর। জলাতঙ্ক রোগের ওষুধ আবিষ্কারের জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে যে পাস্তুর চিরদিন ভাস্বর। পাস্তুর সম্বন্ধে বলেছেন নস্ত্রাদামু। মনে রাখা দরকার, নস্ত্রাদামুর সঙ্গে পাস্তুরের সময়ের প্রায় তিনশ বছরের ফারাক!

বহু শতাব্দী ধরে লুক্কায়িত হারানো বস্তু আবিষ্কৃত হবে। পাস্তুর অভিনন্দিত হবে প্রায় এক ঈশ্বরপ্রতিম ব্যক্তি হিসাবে। চাঁদ যখন তার মহা আবর্তন (great cycle) সম্পূর্ণ করবে—তখন ঘটবে এটা; কিন্তু অন্যান্য জনশ্রুতি সম্মানহানি ঘটাবে তার।

লুই পাস্তুর তাঁর 'ইন্‌স্টিটিউট পাস্তুর' প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ নভেম্বর তারিখে। চাঁদের জ্যোতিষগত আবর্তনের সময়কাল ছিল ১৫৩৯ থেকে ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত! ঈশ্বরপ্রতিম ব্যক্তি হিসেবে তাঁর সম্মানলাভ কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না! আর 'সম্মানহানির জনশ্রুতি'র খোঁজ মেলে আকাদেমির প্রবীণ সদস্যদের মধ্যে। জলাতঙ্কের টীকা বস্তুটাকে তাঁরা

মানতে পারেননি, উঠে-পড়ে লেগেছিলেন পাস্তরের সম্মানহানির জন্য।

নস্ত্রাদামু সম্বন্ধে অষ্টাদশী এরিকা শিথ্যামের কৌতূহলের সূচনা হয়েছিল হিটলার সংক্রান্ত এক বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী থেকে—পাঠক জেনেছেন। নস্ত্রাদামুর চোখে এই হিটলারই দ্বিতীয় খ্রীষ্ট-বিরোধী।

প্রথম নেপোলিয়ঁ, দ্বিতীয় হিটলার। আর তৃতীয়জন? ১৯৯০-এর দশকেই পৃথিবী হয়তো খোঁজ পাবে তার। সে প্রসঙ্গ আপাতত বাদ থাক। নস্ত্রাদামুর চোখে হিটলার—এরিকা শিথ্যামের হাত ধরে এ পথেই হাঁটা যাক আরও কিছুটা।

চতুষ্পদী উদ্ধৃত করার আগে আর-একটা কথা। ভবিষ্যৎকথন যে প্রায়শঃই অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, তার প্রমাণ রেখে গেছে হিটলার আর তার প্রচারসচিব গোয়েব্‌ল্‌স। নস্ত্রাদামুর ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে স্পষ্টতঃই নিজের ছায়া দেখেছিল হিটলার, গোয়েব্‌ল্‌স সেগুলোকে কাজে লাগাতে শুরু করেছিল ১৯৩৬ সাল থেকেই। অধ্যাপক হান্‌স্‌-হেরমান্ ক্রিৎজিঙ্গার-এর লেখা Mysterien von Sonne and Seele বইটা প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে। নস্ত্রাদামু সংক্রান্ত একটা বিশেষ পরিচ্ছেদ ছিল ঐ গ্রন্থে। তাতে বলা ছিল—১৯৩৯ সালে গ্রেট বৃটেনের মহাসঙ্কট সমাপতিত হবে পোল্যাণ্ডের সঙ্কটের সঙ্গে। গোয়েব্‌ল্‌সের স্ত্রী বিষয়টার প্রতি স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গোয়েব্‌ল্‌স জানায় হিটলারকে। চঞ্চল হয়ে ওঠে নাজিবাহিনী। পরের ঘটনা তো ইতিহাস।

নস্ত্রদামু লিখছেন :

বৃহত্তর জার্মানীর এক অধিনায়ক এগিয়ে আসবে মিথ্যা সাহায্য দেওয়ার জন্য...

বৃহত্তর জার্মানীকে হিটলারের তৃতীয় রাইখ্ (Third Reich) বলে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। আর, সাহায্য দেওয়ার অজুহাতেই তো পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেছিল হিটলার।

অতঃপর তৃতীয় শতকের ৫৮ তম চতুষ্পদী :

নরিকান্ পর্বতমালায়, রাইন-এর কাছাকাছি জন্ম নেবে এক বিরাট নেতা ; বড় দেরিতে আসবে সে। পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীকে সে রক্ষা করবে আর তার পরিণতির কথা কেউ কখনও জানতে পারবে না।

অর্থাৎ—অস্ট্রিয়ার কাছাকাছি কোন অঞ্চলে জন্ম নেবে এক নেতা। পোল্যাণ্ড আর হাঙ্গেরীকে সে 'রক্ষা' করবে (হিটলারের 'রক্ষা' মিথ্যা সাহায্য)। এ চতুষ্পদীর সবচেয়ে বিস্ময়কর কথাটা লুকিয়ে আছে ঐ শেষ পঙক্তিতে তার পরিণতির কথা কেউ কখনও জানতে পারবে না! হিটলারের পরিণতি কী হয়েছিল? বিংশ শতাব্দী আজও নিশ্চিত নয়। বার্লিনের সেই বাংকার, হিটলার আর ইভা ব্রাউন—আত্মহত্যা করেছিল ওরা? নাকি পালিয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকায়?

স্বস্তিকা চিহ্নের কথা তো আগেই বলা হয়েছে।

'হিস্টার' সংক্রান্ত নস্ত্রাদামুর চতুষ্পদীগুলোকে তার নিজের অনুকূলে ব্যাখ্যা করার জন্য বেশ কিছু জ্যোতিষী ও ছাত্রকে বন্দী করেছিল হিটলার। এদের মধ্যে ছিলেন হিটলারের নিজস্ব জ্যোতিষী আর্ণস্টক্র্যাফ্‌ট্‌। এইভাবে সাজিয়ে ব্যাখ্যা করে দিতে ঠিক রাজি হয়নি ক্র্যাফ্‌টের মনন। পরিণতি—১৯৪১ সালে এক বন্দী শিবিরে তাঁর মৃত্যু। কিন্তু তার আগে, নস্ত্রাদামুর বিশেষ একটা ভবিষ্যদ্বাণীকে ব্যাখ্যা করে ক্র্যাফ্‌ট্‌ বলেছিলেন—হিটলারকে হত্যার চেষ্টা হবে। হিটলার তখন এক জনসভায়। ক্র্যাফ্‌ট্‌ জরুরী তারবার্তা পাঠিয়ে সতর্ক করে তাকে। বস্তুত, বক্তৃতামঞ্চের পিছনের একটা থামে লুকোনো ছিল বোমা। ঘটনাচক্রে, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সেদিন মঞ্চ ছেড়ে চলে গিয়েছিল হিটলার আর কিছু অনুচর। যারা থেকে গিয়েছিল, বোমার বিস্ফোরণে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল তারা। নস্ত্রাদামুর ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ ছিল না একনায়ক হিটলারের। চতুষ্পদীটা এ-রকম:

> **নতুন এক দৃশ্য দেখার জন্য জমায়েত হবে জনতা। বহু দর্শকের মধ্যে রাজপুত্র ও রাজারাও থাকবে। স্তম্ভগুলো, দেওয়ালগুলো পড়ে যাবে, কিন্তু কোন অলৌকিক ঘটনার ফলে রক্ষা পাবে রাজা আর উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ত্রিশজন লোক।**

চতুষ্পদীটির ব্যাখ্যা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে। ভবিষ্যদ্বাণীর এ এক বিপদ। দু'তিন রকম ব্যাখ্যা অথবা ইচ্ছাকৃত ভুল ব্যাখ্যার সম্ভাবনা সব সময়ই থাকে। নজির খোঁজা যায় অ্যাবে তর্নের ব্যাখ্যায়। নস্ত্রাদামুর ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ে কিছু সময় অন্তর প্রকাশনা করতেন তর্নে। বলা হয়,

তার এইসব প্রকাশনা রাজনীতিক মতামতের ওপর গভীর ছাপ ফেলেছিল আর তাঁর ফলেই নাকি ফ্রান্স তৈরি করেছিল কুখ্যাত ম্যাজিনো লাইন। বিশ্বাস করা শক্ত।

মিশেল দ্য নস্ত্রাদামুর ভাবনার মানচিত্রে বাদ পড়েনি স্পেনও। লক্ষ্য করা যাক—

কাস্তিল্ থেকে ফ্র্যাঙ্কো গণপরিষদের সূচনা করবে; রাজদূতরা রাজি হবে না, ভাঙন ধরাবে তারা। ভিড়ের মধ্যে থাকবে রিভিয়েরার লোকেরা, আর ঐ বিরাট মানুষকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না উপসাগরে।

ফ্র্যাঙ্কো—এই শতাব্দীতে স্পেনের সেই একনায়কের নাম ইতিহাস ভুলতে পারে না। প্রাইমো দ্য রিভেরাই সেই স্পেনীয় একনায়ক, ফ্র্যাঙ্কো যার বিচার করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত সিংহাসনচ্যুত করতেও পেরেছিল। ফ্র্যাঙ্কোকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল মরক্কোয়, ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করার অনুমতি দেওয়া হয়নি তাকে। গৃহযুদ্ধের সময়, অবশেষে, স্পেনের মাটিতে পা রাখতে পেরেছিল সে। নস্ত্রাদামুর ভবিষ্যৎকথন বাস্তবকে ছুঁয়েছে।

আরও এগিয়েছে মিশেলের জীবন। বর্ষপঞ্জী বাজার পেয়েছে, প্রচুর অর্থ এসেছে মিশেলের ঘরে। ১৫৫২ সালে প্রকাশিত হয়েছে তার বিখ্যাত রচনা Traite des fardemens.

১৫৫৪ সাল। বিকাল। বাতাসে উষ্ণতার স্বাদ। পাখিদের বুক-চেরা ডাকে উদাস মিশেল। দৃষ্টিতে বড় শূন্যতা। ঐ দূরে আকাশ মিশেছে দিগন্তে। একদিন তাকেও মিলতে হবে কোন মোহনায়, যেখানে জীবন আর মৃত্যুর মেশামিশি খেলা। একান্নটা বসন্ত পেরিয়ে জীবন তো আজ মোহনার কাছাকাছি। অথচ...

ক্লান্ত লাগে মিশেলের। আজও এমন কিছু করা হল না যা ঐ মোহনার পরেও বাঁচিয়ে রাখবে তাকে, মরণের অতলান্ত সমুদ্রে হারিয়ে যাবে না এই মিশেল নস্ত্রাদামুর সবটুকু অস্তিত্ব। এমন কিছু করা হল না, যা আগামী পৃথিবীর বুকে লিখে রাখবে তার গানের স্বরলিপি। ছোট্ট এক সীমার মাঝে ফুরিয়ে যাবে জীবন। বিষন্ন মিশেল।

‘একজন দেখা করতে এসেছে তোমার সঙ্গে।’

চোখ তুলে অ্যান্‌কে দেখল মিশেল, 'কে?'

'চিনি না। নাম বলছে শ্যাভিনি। বিউন্ (Beaune) -এর মেয়র ছিল নাকি।'

'আসতে বলো।'

বছর ত্রিশ বয়সের এক যুবক ঘরে এল। মিশেলকে 'বাও' করে কথা বলল সে, 'আমার নাম জাঁ-এইমে দ্য শ্যাভিনি।'

'বসুন। বলুন কী করতে পারি আপনার জন্য?'

'আমি আপনার ছাত্র হতে চাই।'

'ছাত্র? আমার? আপনি বিউন্-এর মেয়র ছিলেন শুনলাম?'

'ছিলাম, ছেড়ে দিয়েছি।'

মিশেল কিছুটা বিস্মিত, 'আপনি কী বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন?'

বিনীত কণ্ঠে কথা বলে শ্যাভিনি, 'থিওলজি আর আইন বিষয়ের ডক্টরেট আমি। কিন্তু আরও জানতে চাই আমি, অনেক কিছু শিখতে চাই। আপনি আমার শিক্ষক হোন।'

চুপচাপ কিছুক্ষণ ভাবে নস্ত্রাদামু। এভাবে তার কাছে শেখার জন্য এতদিন কেউ আসেনি। অথচ এই ছেলেটি অনেক কিছু ত্যাগ করে আসতে চাইছে তার কাছে। আর এই যুবকের চোখে-মুখে বড় ঔজ্জ্বল্য। মাথা তোলে নস্ত্রাদামু, 'আমার কথা আপনি কোথায় শুনলেন?'

'জাঁ দোরার কাছে। উনি আপনাকে খুবই শ্রদ্ধা করেন। দোরাই মাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

জাঁ দোরা! ফরাসী রাজসভার সুখ্যাত কবি। চিন্তাশীল মানুষ। রাজসভার পদ ছাড়াও কলেজ্ দ্য ফ্রান্স-এর গ্রীকভাষার অধ্যাপক। দোরার নাম শুনে নস্ত্রাদামু আর আপত্তি করল না। শুধু বলল, 'ছাত্র হিসেবে আপনাকে নিতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু, আপনার সামনে ছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। সে-সব ছেড়েছুড়ে এই পথে—'

কথার মাঝে বাধা দেয় শ্যাভিনি, 'সবকিছু ভেবেই আমি এসেছি, মসিয়ঁ। আগেই তো বলেছি—আমি জানতে চাই, শিখতে চাই। জ্ঞান আমার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু।'

মৃদু হাসি ছড়িয়ে পড়ল মিশেল নস্ত্রাদামুর মুখে।

রয়ে গেল শ্যাভিনি। ভবিষ্যতের পৃথিবীর কাছে নস্ত্রাদামুর ঠিকানা পৌঁছে দেওয়ার কাজে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে এই যুবক।

দিন যায়।

মিশেলের কাছে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাঠ নিচ্ছে শ্যাভিনি। আর মাঝেমাঝেই তাগাদা দিচ্ছে, 'লেখাটা করে ফেলুন।'

লেখা : নস্ত্রাদামুর ভবিষ্যৎদর্শন, ভবিষ্যৎকথনের দলিল। ভবিষ্যতের—সপ্তদশ, অষ্টাদশ, ঊনবিংশ, বিংশ—বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে নানান ছবি আজ নস্ত্রাদামুর সামনে স্পষ্ট। সেগুলোকে রূপ দিতে হবে ভাষায়। পরিকল্পনার একটা রূপরেখা তৈরি করেছে মিশেল। শতকে ভাগ করে করে রচিত হবে আগামীর কথা (একটা কথা এখানে বলে রাখা দরকার এইগুলোই পরবর্তীকালে Centuries নামে পরিচিত হয়েছে। কিন্তু 'সেঞ্চুরি'র অর্থ এখানে শতাব্দী নয়। অর্থাৎ, এক একটি শতাব্দীর জন্য একেকটি ভাগ—এমন নয়। সেঞ্চুরি অর্থাৎ শতক। একশোটা চতুষ্পদীকে একত্র করে এক একটা চতুষ্পদী-শতকের পরিকল্পনা ছিল মিশেল নস্ত্রাদামুর। ইচ্ছে ছিল এরকম দশটা সেঞ্চুরি লেখার, অর্থাৎ মোট এক হাজার চতুষ্পদী। এই পরিকল্পনা মতোই লিখেছিলেন তিনি। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক, সপ্তম শতকটা কখনোই শেষ করে উঠতে পারেননি। অষ্টম,নবম, দশম অবশ্য শেষ করেছিলেন। জানা যায়—আরও দুশো চতুষ্পদী, অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শতক লেখার কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু মৃত্যু, সেই চিরন্তন অনিবার্যতা, সে ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত হতে দেয়নি)। শ্যাভিনির অবিরাম তাগাদায় লেখার কাজে হাত দিল মিশেল।

১৫৫৫ সাল। কয়েকজন মানুষের চোখে ঘুম নেই। মিশেল দ্য নস্ত্রাদামু, অ্যান্ পঁসার্ত নস্ত্রাদামু, জাঁ-এইমে দ্য শ্যাভিনি। লিওঁ থেকে প্রকাশিত হয়েছে Prophecies গ্রন্থের প্রথম খণ্ড। মুখবন্ধে এ গ্রন্থ প্রথম পুত্র সেজার নস্ত্রাদামুর নামে উৎসর্গ করেছে মিশেল। এই প্রথম খণ্ডের শরীরে ছড়িয়ে আছে ৩৫৩টি চতুষ্পদী। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শতকের পুরোটা, আর চতুর্থ শতকের ৫৩টি চতুষ্পদী। আসল নস্ত্রাদামু আত্মপ্রকাশ করল সেইদিন।

গোটা ব্যাপারটা সম্বন্ধে শ্যাভিনি যতটা ওয়াকিবহাল, অ্যান্ ঠিক ততটা নয়। 'প্রফেসিজ্'-এর একটা কপি পড়তে পড়তে জিজ্ঞাসু চোখে মিশেলের দিকে তাকাল ও, 'ভাষাটা...'

'কৌশল—'ছোট্ট জবাব মিশেলের।

'মানে?'

ব্যাখ্যা করতে এগিয়ে আসে শ্যাভিনি, 'ইচ্ছাকৃতভাবেই উনি এক দুর্বোধ্য, অস্পষ্ট রীতিতে লিখেছেন। তাছাড়াও দেখবেন, নানান ভাষার শব্দ মিশে আছে চতুষ্পদীগুলোর মধ্যে। ফরাসী ভাষা আছে, প্রভাঁসের আঞ্চলিক শব্দ

আছে, ইতালিয়ান, গ্রীক শব্দ আছে। লাতিন ভাষাও বাদ যায়নি। কারণটা তো আসলে—'

হেসে ওঠে অ্যান্। হ্যাঁ, কারণটা এখন স্পষ্ট ওর কাছে। চার্চ, ইন্‌কুইজিশন! নির্যাতনের হাত এড়াতে এক দুর্বোধ্য অস্পষ্টতার আশ্রয় নিয়েছে চতুর মিশেল। না হলে, ধর্মবিরোধী যাদুকর আখ্যা দিয়ে নামিয়ে আনা হবে ধর্মের নিপীড়ন-যন্ত্র। সময়ের বিষয়টাও ইচ্ছাকৃতভাবেই এলোমেলো করে দিয়েছে ও, যাতে কোন অনভিজ্ঞ লোক চতুষ্পদীগুলোর সঠিক অর্থ উদ্ধার করতে না পারে।

শুরু হল গুঞ্জন। কী বলতে চায় এই লোকটা?

প্রশ্নটা উঠল রাজসভাতেও। নানা মুনির নানা মত। কেউ বলে— বেশ বেশ। কেউ বলে—নচ্ছার। এতসব বিতর্ক-কুতর্কের খেলায় মিশেল দ্য নস্ত্রাদামু হয়ে উঠল ফ্রান্স তথা গোটা ইওরোপে এক পরিচিত নাম। শিক্ষিত মহলের একটা অংশ, বিশেষত চিকিৎসক ও জ্যোতিষীরা, কুৎসিতভাবে আক্রমণ করল নস্ত্রাদামুকে: এসব কী? নিজের পেশাকে অপমান করে এ কোন্ রঙ্গ দেখাচ্ছে বর্বরটা? ছড়িয়ে পড়ল নানান ব্যঙ্গমূলক ছড়া।

মিশেল হাসে, 'বুঝলে শ্যাভিনি, এসব কিছু না। আমার কথা দাম পাবে অনেক দিন পরে।'

'কতদিন পরে?'

দিগন্তে চোখ রেখে কথা বলে মিশেল, 'দুশো বছর, কিংবা চারশো বছর পরে।'

মিশেলকে এতদিনে কিছুটা চিনেছে শ্যাভিনি। তবু এক বিস্ময় খেলা করে ওর শরীরে—সেই দূরতম ভবিষ্যতের বুক থেকে কিভাবে আশার রস আহরণ করে এই মানুষ! কিছু একটা বলতে যায় ও, তার আগেই ঘরে ঢোকে অ্যান।

'ডাক পড়েছে!' অ্যানের গলা কাঁপছে।

'কোথায়?'

'পারীতে, রাজবাড়িতে!'

শ্যাভিনি চমকে ওঠে। রাজবাড়িতে? ফ্রান্সের রাজা তখন দ্বিতীয় হেন্‌রি। তিনি ডাকছেন নস্ত্রাদামুকে? কেন?

কিন্তু মিশেলের মুখের একটা পেশীও কুঞ্চিত হল না। কেমন এক ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যাচ্ছে ওর শরীরেও, তবু আচার-আচারণে তার কোন ছাপ নেই। অ্যানকে শুধোল ও, 'কে খবর দিল?'

'রাজার দূত এসেছেন।'

উঠে পড়ে নস্ত্রাদামু। বসার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। ছুটে এসে ওর হাত ধরে ন'বছরের বালক সেজার। পিছনে শ্যাভিনি।

না, রাজার পক্ষ থেকে আসেননি দূত। এসেছেন রানীর পক্ষ থেকে। ফ্রান্সের রানী ক্যাথারিন দ্য মেদিসি ডেকে পাঠিয়েছেন মিশেলকে। কেন? না, দূত তা জানেন না। তাঁকে শুধু বলা হয়েছে—আহ্বান জানিয়ে আসবে ঐ ভবিষ্যদ্বক্তাকে, সসম্মানে।

প্রশ্ন করে মিশেল, 'কিন্তু, এখান থেকে পারী তো কম দূর নয়! যেতে প্রায় মাস দুয়েক তো লাগবেই!'

'না।' বিনীতকণ্ঠে উত্তর দেয় দূত, 'প্রতিটি পোস্টে আপনার জন্য বিশেষ ঘোড়ার ব্যবস্থা রাখতে বলেছেন রানীমা। এক মাসের মধ্যেই রাজধানীতে পৌঁছে যাবেন আপনি। আর কিছু?'

'না, আর কিছু আমার জানার নেই।'

'তাহলে—'

'হ্যাঁ, রানীমাকে জানিয়ে দেবেন—আমি যাচ্ছি।'

'কবে রওনা হচ্ছেন?'

একটু ভেবে নেয় মিশেল, 'আজ তো হচ্ছে আট তারিখ। কাল,পরশু...না, চোদ্দই জুলাই রওনা হবো আমি। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে। সব ব্যবস্থা করা থাকবে।'

১৪ জুলাই, ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ। রানী ক্যাথারিনের ডাকে পারীর পথে যাত্রা করল ভবিষ্যদ্বক্তাদের রাজা। প্রতিটি পোস্টে মোতায়েন রাখা হয়েছে চনমনে তাজা ঘোড়া। দিনের পর দিন পথ চলেছে নস্ত্রাদামু। আর চলার পথে বারবার দুলে উঠছে প্রশ্নটা—কেন ডেকেছেন রাজরানী? কী আছে বরাতে : শাস্তি, না সমাদর? প্রশ্ন ভাসছে, ঝাপ্‌সা একটা উত্তরও ভেসে যাচ্ছে চোখের সামনে দিয়ে।

১৫ আগস্ট, ১৫৫৬, নোৎরদেম-এর কাছাকাছি স্যোঁ মিশেল্ সরাইখানার সামনে এসে দাঁড়াল একটি ক্লান্ত ঘোড়া, নেমে এল তার ততোধিক ক্লান্ত তিপ্পান্ন বছর বয়সী আরোহী। সরাইখানার মালিকের কাছে এগিয়ে গিয়ে সেই ক্লান্ত মানুষ প্রশ্ন করল, 'একটা ঘর পাওয়া যাবে, মসিয়ঁ?'

'যাবে।' সরাইখানার মালিক কম কথার লোক। অশ্বারোহীকে সে নির্দিষ্ট একটা ঘরে পৌঁছে দিল। বাইরে বাঁধা রইল তার বাহন। এক মাসের অবিরাম ঘোড়দৌড়ে ক্লান্ত মিশেল নস্ত্রাদামুর চোখে নেমে এল ঘুমের ছায়া।

ঘুম ভাঙল একটু বেলায়। সরাইখানার বাইরে বেরিয়ে এল মিশেল। সকাল হয়েছে। পৃথিবীতে জীবনের স্পন্দন। সূর্যের সকালী কিরণ শরীরে মেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ও। ঠিক তখনই পায়ে পায়ে এগিয়ে এল এক সুন্দর পুরুষ।

'মাপ করবেন মসিয়ঁ, আপনিই তো মিশেল দ্য নস্ত্রাদামু?'

প্রশ্ন শুনে ঘুরে দাঁড়াল, 'হ্যাঁ, আমিই। আপনি?'

'রানী ক্যাথারিন আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অনেক আগেই এসে পড়েছি। আপনার ঘুম ভাঙেনি শুনে অপেক্ষা করছিলাম। আপনি কি এখনই—'

'আমি তৈরি। চলুন।'

ফ্রান্সের রাজমহিষী ক্যাথারিন দ্য মেদিসির সঙ্গে দেখা করার জন্য এগিয়ে চলল মিশেল নস্ত্রাদামু।

৬
তরুণ সিংহ

না, রাজদরবারে নয়। রানী ক্যাথারিন নস্ত্রাদামুকে বসালেন এক নিভৃত কক্ষে। সারা ফ্রান্সের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী এই রূপসী। কী আছে রূপবতী কন্যার মনের গহনে? নস্ত্রাদামু ভাবে। নিভৃত কক্ষে প্রগাঢ় নৈঃশব্দ্য। বুঝি কিসের প্রতীক্ষা।

অন্দরের দরজা খুলে গেল। ধীর পায়ে কক্ষে প্রবেশ করলেন ক্যাথারিন দ্য মেদিসি। উঠে দাঁড়িয়ে শরীর ঝুঁকিয়ে রানীকে অভিবাদন জানাল নস্ত্রাদামু।

'আপনার সঙ্গে আমার কিছু গোপন কথা আছে।'

'বলুন।'

'বলছি। কিন্তু, একটা শর্ত আছে আমার। আমাদের এ আলোচনার কথা বাইরের কেউ যেন জানতে না পারে।'

'প্রতিপালিত হবে আপনার শর্ত।'

ভাল করে মিশেলকে দেখলেন ক্যাথারিন। মানুষটির সর্বাঙ্গে এক তীক্ষ্ণতার ছাপ। কথা বললেন রানী, 'ইতালীয় জ্যোতির্বিদ লুক্ গরিক্-এর নাম শুনেছেন আপনি?'

'শুনেছি। উনি তো বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ।'

'হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে ওঁর পরিচয় আছে?'

'না, সে সুযোগ পাইনি।'

একটু ইতস্তত করলেন ক্যাথারিন। তারপর বললেন, 'শুনুন মসিয়েঁ, লুক্ গরিক্ আমার স্বামীর কাছে এক গোপন পত্র পাঠিয়েছেন। ঐ পত্রে তিনি আমার স্বামীকে আবদ্ধ স্থানে যে-কোন ধরনের ডুয়েল লড়তে নিষেধ করেছেন। বিশেষত আমার স্বামীর একচল্লিশ বছর বয়স সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন গরিক্। ওঁর হিসেবমতো ঐ সময়ে রাজার মস্তিষ্কে আঘাত লাগার সম্ভাবনা, আর তার ফলে নেমে আসবে অন্ধত্ব, এমনকি মৃত্যু হওয়াও বিচিত্র নয়। রাজসভায় কয়েকজনের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছেন রাজা। তবে, উনি নিজে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না ব্যাপারটাকে।'

ক্যাথারিন থামলেন। নস্ত্রাদামু এতক্ষণে বুঝতে পারছে—কেন এই জরুরী তলব। তবু, সৌজন্যের খাতিরেই ও শুধোয়, 'বুঝলাম। কিন্তু এর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'

উঠে গিয়ে একটি সুদৃশ্য পেটিকা খুললেন রানী ক্যাথারিন। বার করে আনলেন একখানি গ্রন্থ। মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল মিশেলের। ঐ গ্রন্থের সঙ্গে তার কিছু-কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। গ্রন্থের নাম 'প্রফেসিজ্,' লেখক মিশেল দ্য নস্ত্রাদামু!

বসলেন ক্যাথারিন, 'আপনার বইয়ের বিশেষ একটা ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে জানতে চাই আমি।'

'বলুন।'

পাতা ওল্টালেন রানী। নির্দিষ্ট একটা পাতায় এসে আঙুল দিয়ে বিশেষ একটা চতুষ্পদী নির্দেশ করলেন। প্রথম শতকের পঁয়ত্রিশতম চতুষ্পদী। লেখা আছে :

দ্বৈত সংগ্রামের যুদ্ধক্ষেত্রে বর্ষীয়ান সিংহটি পরাভূত হবে তরুণ সিংহের কাছে; সুবর্ণনির্মিত পিঞ্জরে সে বিদ্ধ করবে বর্ষীয়ান সিংহটির চক্ষুদ্বয়; একটি চক্ষে সৃষ্টি হবে দুটি ক্ষত; তারপর, এক নির্মম মরণ।

'এর অর্থ কী?'

মিশেল নস্ত্রাদামু গম্ভীর, 'আপনার অনুমান যথার্থ, মহিমময়ী রানী এ চতুষ্পদী আপনার স্বামী, ফ্রান্সের মহান নৃপতি দ্বিতীয় হেনরীর ভবিষ্যতেরই

ইঙ্গিত দিচ্ছে।'

'তাহলে ?' ক্যাথারিন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

নস্ত্রাদামু নির্বাক। বহুক্ষণ পরে, ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে ও, 'নিষ্কৃতির উপায় আমি বলতে পারবো না। শুধু লুক্ গরিকের মতই বলবো—রাজা সতর্ক থাকুন, সাবধান থাকুন। তবে...'

'তবে ?'

বড় দ্বিধায় ভুগছে মিশেল, কণ্ঠস্বরে জড়তা, 'তবে আমার ভবিষ্যৎদর্শন ভুল প্রতিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা বড় কম।'

ফ্রান্সের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী সেই রূপবতী কন্যার চোখের বেড়া টপকে পৃথিবীর মাটিতে নেমে এসেছিল জমে থাকা একরাশ জলকণা। বুঝি রাতভোর শিশিরে সিক্ত ধরিত্রীর অহল্যাভূমি।

মিশেলকে রানী পাঠিয়েছিলেন রাজা দ্বিতীয় হেনরির কাছে। অল্পক্ষণ মিশেলের কথা শুনেছিলেন হেনরি, শুনেছিলেন তার সতর্কবাণী। গুরুত্ব দেননি। এমন কত কথাই তো বলে থাকে কতজন। এ-সব কথায় গুরুত্ব দিতে হলে জীবনটা যে বিস্বাদ হয়ে যাবে! একশোটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে নস্ত্রাদামুকে বিদায় জানিয়েছিলেন হেনরি। ক্যাথারিন দিয়েছিলেন ত্রিশটি। একশো ত্রিশটি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে ফিরে এসেছিল নস্ত্রাদামু।

তারপর সাগরের বুক দিয়ে, নদীর শরীর বেয়ে, বয়ে গেল অনেক জলধারা। আবার রানীর নিভৃত কক্ষে ডাক পড়ল নস্ত্রাদামুর। ক্যাথারিনের সাত সন্তানের জন্মপত্রিকা রচনার দায়িত্ব অর্পিত হল তার ওপর। নস্ত্রাদামু জানাল—ক্যাথারিনের চারজন পুত্রই ভবিষ্যতে রাজা হবে। হয়ত-বা সামান্য ভুল ছিল হিসেবে—ক্যাথারিনের অন্যতম পুত্র ফ্রাঁসোয়া সিংহাসনে বসার আগেই মারা গিয়েছিল। অথবা, ভুল বলেনি নস্ত্রাদামু। চারজন রাজার ছবি দেখেছিল ও। ক্যাথারিন-পুত্র তৃতীয় হেনরি ফ্রান্সের সিংহাসনে বসার আগে রাজা হয়েছিল পোল্যাণ্ডের!

আর দ্বিতীয় হেনরি ? আসছি তাঁর কথায়। শুধু বলে নিই মাঝসময়ের ছোট্ট একটি কথা। হয়ত, অতিকথা।

বাতের বেদনায় শয্যাশায়ী মিশেল। এই বাত আর আথ্রাইটিস্ তাকে পরবর্তী জীবনে আক্রমণ করেছে বারবার। ঘরে শুয়ে আছে মিশেল। খানিক আগেই এক অভিজাত সন্তান এসেছিল নিজের ভাগ্য জানতে। এমন বহুজন আসে। ভবিষ্যৎ জানতে, জন্মপত্রিকা তৈরি করাতে।

কিছু বুঝি ভাবছিল যন্ত্রণাকাতর মিশেল। ঠিক তখনই ঘরের দরজায়

প্রচণ্ড করাঘাত।

'দরজা খোলা আছে—' মিশেল জানায়।

সবেগে ঘরে প্রবেশ করে এক বালক। হাঁপাচ্ছে রীতিমত। নিশ্চয়ই ছুটতে ছুটতে আসছে। কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে যায় বালকটি। হাত তুলে তাকে নিরস্ত করে ভবিষ্যদ্বক্তাদের রাজা। মৃদুকণ্ঠে বলে, 'অঁল্যাস্এর রাস্তায় খোঁজ করো, কুকুরটাকে পেয়ে যাবে। তাকে এখন বেঁধে ফেলা হয়েছে।'

বালক স্তম্ভিত। অভিজাত বোভেই পরিবারের এক দামী কুকুর হারিয়ে গেছে। এই বালককে দিয়ে বোভেইরা খবর পাঠিয়েছে মিশেল নস্ত্রাদামুর কাছে—কোথায় পাওয়া যাবে কুকুরটাকে? আশ্চর্য! সে কথা তো এখনও বলাই হয়নি শয্যাশায়ী মানুষটিকে। তাহলে? কুকুর হারানোর কথা উনি জানলেন কী করে?

হাতের ইশারায় বালকটিকে যেতে বললো নস্ত্রাদামু। ঝড়ের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল বালক। অঁল্যাস্-এর রাস্তায় পৌঁছে ওকে সবিস্ময়ে দেখতে হল—বোভেই পরিবারের এক ভৃত্য নিয়ে আসছে হারিয়ে যাওয়া কুকুরটাকে। এবং কুকুরটার গলায় পরানো হয়েছে চামড়ার বন্ধনী!

জলপ্রপাতের মতো ছড়িয়ে পড়ল এ সংবাদ। বিস্মিত মানুষের চোখে নস্ত্রাদামু হয়ে উঠল এক অতিলৌকিক চরিত্র।

অতঃপর সময়পট ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দ, এবং—ফ্রান্সের একচ্ছত্র অধিপতি দ্বিতীয় হেনরি!

গ্রীষ্মকাল। ফ্রান্সের জমজমাট রাজপ্রাসাদে উৎসবের বন্যা। একটা নয়, একসঙ্গে দু-দুটো বিয়ে। রাজনীতিক ক্ষেত্রে দুটো বিয়েই গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় হেন্‌রি আর ক্যাথারিনের কন্যা এলিজাবেথ-এর সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ-এর, আর দ্বিতীয় হেন্‌রির বোন মার্গেরিত্-এর সঙ্গে স্যাভয়ের ডিউকের। জোড়া বিয়েকে আরও বর্ণাঢ্য করে তোলার জন্য তিনদিন ব্যাপী উৎসবের আয়োজন। রু স্যেঁ আঁতোয়েতে অনুষ্ঠিত হবে এক নানান প্রতিযোগিতা।

অনুষ্ঠিত হচ্ছে দ্বন্দ্বযুদ্ধ। মুখোমুখি হচ্ছে দুই অশ্বারোহী। এ প্রতিযোগিতার অন্যতম প্রতিযোগী স্বয়ং ফরাসীরাজ দ্বিতীয় হেন্‌রি। প্রথম দুদিনের সব কটি দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়ী হয়েছেন হেন্‌রি। আজ তৃতীয় দিন। আজ রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী গ্যাব্রিয়েল লর্গে, কঁৎ দ মন্তগোমারি। স্কটিশ সৈন্যদলের ক্যাপ্টেন এই মন্তগোমারি। দক্ষ যোদ্ধা।

আঘাত হানলেন মন্তগোমারি। ঝন্ ঝন্ করে উঠল রাজা হেন্‌রির ঢাল। কিন্তু নিজের আসনে হেন্‌রি অটল। এত সহজে তাঁকে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে ফেলে দেওয়া যাবে না। বর্শা চালালেন হেন্‌রি। সুদক্ষ মন্তগোমারি আত্মরক্ষা করলেন নিপুণভাবে।

তৈরী হচ্ছেন মন্তগোমারী। আর ঠিক তখন, রাজার দিকে তীরবেগে ছুটে আসতে দেখা গেল একটি মানুষকে। দাঁড়িয়ে পড়লেন মন্তগোমারি! সেই মানুষ রাজার হাতে ধরিয়ে দিল ছোট্ট একটি চিরকূট। হেন্‌রি পড়লেন 'ঈশ্বরের দোহাই, বন্ধ করো এ দ্বৈতযুদ্ধ—ক্যাথারিন।' দর্শকদের মধ্যে থেকে চিরকূট পাঠিয়েছেন ফ্রান্সের রাজমহিষী।

ব্যাঙ্গের হাসি ফুটল হেন্‌রির ঠোঁটে। সেই ভবিষ্যদ্বাণী! ছোঃ!

ফিরে গেল লোকটি। আবার তৈরি হচ্ছেন রাজার প্রতিদ্বন্দী। দর্শকদের মধ্যে থেকে তখন তারস্বরে চিৎকার করে উঠল এক বালক, 'রাজা, তুমি লড়াই কোরো না।' থমকে গেলেন মন্তগোমারি। কোথায় যেন বাজনা বাজছে অমঙ্গলের । এগিয়ে এসে রাজাকে বললেন তিনি, 'এ যুদ্ধ এখানেই শেষ করুন রাজা। আর প্রয়োজন নেই।'

হেন্‌রি নির্বিকার, 'আরে তুমিও কি ঐ বাচ্চাটার মতো অবোধ নাকি, অ্যাঁ? নাও নাও, শুরু করো। লড়াইটা জমে উঠেছে হে!'

অনিচ্ছুক প্রতিপক্ষ ফিরে গেলেন নিজের নির্দিষ্ট স্থানে। দৌড় শুরু করল তাঁর তেজীয়ান অশ্ব।

শূন্যে ছিটকে উঠল দুটো বর্শা। দুই তীক্ষ্ণ অস্ত্রের সংঘাত, ঝন্‌ঝনা। ভেঙে গেল মন্তগোমারির বর্শা। এবং সেই বর্শার সুতীক্ষ্ণ ফলক তীরবেগে নেমে এসে হেন্‌রির শিরস্ত্রাণের মুখাবরণ ভেদ করে সজোরে বিদ্ধ হল ফরাসী নৃপতির চোখে। সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেলেন হেন্‌রি।

রণাঙ্গন স্তম্ভিত। দর্শকরা বিমূঢ়। ক্যাথারিন সংজ্ঞাহীন। মন্তগোমারি আতঙ্কে বিবর্ণ।

পরবর্তী দশটা দিন অসহ যন্ত্রণায় ছটফট করলেন দ্বিতীয় হেন্‌রি। দশম দিনে, নিভে গেল নৃপতির জীবনদীপ।

দ্বৈত সংগ্রামের যুদ্ধক্ষেত্রে তরুণ সিংহ মন্তগোমারি পরাভূত করেছে বর্ষীয়ান সিংহ দ্বিতীয় হেন্‌রিকে; সুবর্ণনির্মিত পিঞ্জর অর্থাৎ শিরস্ত্রাণের জাল-দেওয়া মুখাবরণ ভেদ করে তার বর্শা বিদ্ধ করেছে রাজার চোখ; গভীর ক্ষত; আর—দীর্ঘ দশদিনের অসহ যন্ত্রণামাখা এক নির্মম মরণ! অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে মিশেল দ্য নস্ত্রাদামুর ভবিষ্যৎকথন!

মৃত্যুর আগে হেন্‌রি বলে গিয়েছিলেন—মন্তগোমারির কোন দোষ নেই, তাকে যেন ক্ষমা করা হয়। কিন্তু সে আশ্বাসবাণীতে আস্থা রাখতে পারেনি তরুণ সিংহটি। পালালো মন্তগোমারি। ওর আশঙ্কা কিন্তু ভিত্তিহীন ছিল না। স্বামীহারা ক্যাথারিন ওকে ক্ষমা করতে পারেননি। খোঁজ করে করে অবশেষে এই তরুণ সিংহটিকে গ্রেপ্তার করেন প্রতিহিংসাজর্জর ক্যাথারিন। কারারুদ্ধ হয় মন্তগোমারি। আর, আশ্চর্য, এই গ্রেপ্তারীর ইঙ্গিতও দেওয়া ছিল 'প্রফেসিজ'-এর আরেকটি চতুষ্পদীতে। ফ্রান্সের সর্বোচ্চ পদস্থ কর্মচারী মঁৎমরেঁসি মন্তব্য করেছিলেন, 'ওহ্, কী অশুভ, কী সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী! লোকটার দৈবশক্তিকে আমি অভিশাপ দিই।' কার কথা বলেছিলেন মঁৎমরেঁসি? লুক্ গরিক্-এর? নাকি, মিশেল দ্য নস্ত্রাদামুর? লোকে বুঝেছিল এ মন্তব্য ঐ দ্বিতীয় জনের উদ্দেশ্যেই। পারীর এক ময়দানে পোড়ানো হল নস্ত্রাদামুর কুশপুত্তলিকা। দাবী উঠল—নস্ত্রাদামুর বিচার করুক চার্চ। দু দশক পরে মিশেলের জীবনে তুলোর সেই ইন্‌কুইজিশনের কালো ছায়ার ঘোরাফেরা।

কিন্তু দ্বিতীয় হেন্‌রির শূন্য সিংহাসনে তখন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় ফ্রাঁসিস। নস্ত্রাদামুর প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। তাঁর মতে—না, মিশেল দ্য নস্ত্রাদামুর কোন অপরাধ নেই। তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তা অগ্রাহ্য করার ফল পেতে হয়েছে পিতাকে। আমাদের উচিত এই মানুষটির ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা জানানো। বেঁচে গেল মিশেল।

৭
তিনে ক্ষেত্র—রণক্ষেত্র

পয়লা নম্বর নেপোলিয়ঁ, দোসরা হিটলার। তিন নম্বর কে? কবে আসবে সে? কেন আসবে?

নস্ত্রাদামু বারবার উল্লেখ করেছেন এই খ্রীষ্ট-বিরোধী তৃতীয়জনের কথা। নানান চতুষ্পদীর মাঝে ছড়িয়ে আছে এই বিপজ্জনক মানুষ। কোথাও তার নাম অ্যালিয়ুস্ (Alus), কোথাও ম্যাবিয়ুস্ (Mabus)। যেন লাতিন শব্দ ম্যালিয়ুস (Malus) দুটো ভিন্ন নামে ছড়িয়ে পড়েছে। লাতিন ভাষায় ম্যালিয়ুস্ মানে অশুভ ব্যক্তি! আর এই বিপজ্জনক মানুষের হাতেই রয়েছে তৃতীয়

বিশ্বযুদ্ধের চাবিকাঠি।

নস্ত্রাদামুর হিসেবে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হবে নিউ ইয়র্ক শহরের ওপর আক্রমণের মধ্যে দিয়ে। আর এ আক্রমণে ব্যবহৃত হবে বোমা, ব্যবহৃত হবে রাসায়নিক অস্ত্রও।

৪৫ ডিগ্রীতে দগ্ধ হবে আকাশ। বিরাট নতুন শহরের দিকে এগিয়ে যাবে আগুন। তারপরেই লাফিয়ে উঠবে—অত্যুচ্চ, ছিন্নবিচ্ছিন্ন অগ্নিশিখা,—যখন তারা প্রমাণ চাইবে নর্ম্যানদের।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নিউ ইয়র্ক শহরটা ৪০ থেকে ৪৫ সমাক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত। আক্রমণের চেহারা হবে ব্যাপক। ছিন্নবিচ্ছিন্ন অগ্নিশিখা বলতে, আজকের যুগে, একটা ছবিই ভেসে ওঠে চোখের সামনে—পারমাণবিক বোমার সেই অগ্নিগোলক! নর্ম্যান শব্দের মধ্যে যেন ফ্রান্সের ইঙ্গিত।

নিউ ইয়র্ককে কেন্দ্র করে আরও কিছু বলেছেন নস্ত্রাদামু:

জগতের উদ্যান, নতুন শহরের কাছাকাছি, ফাঁপা পর্বতের পথে। এটা অধিকৃত হবে, নিক্ষিপ্ত হবে ট্যাঙ্কে, গন্ধকে বিষিয়ে-যাওয়া জল পান করতে বাধ্য হবে লোকে।

সরলীকৃত ব্যাখ্যায় মনে হয়—নিউ ইয়র্কের জল সরবরাহ ব্যবস্থায় বিষ মেশানো হবে। গন্ধক বা অত্যাধুনিক কোন রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে। কিন্তু, ১৯৮৩ সালের নভেম্বর মাসে সুস্পষ্টভাবে জানা গেলো একটা তথ্য—পেন্‌সিলভানিয়ার হ্যারিসবার্গ থেকে ১৯৭৯ সাল থেকেই তেজস্ক্রিয় পদার্থে দূষিত জল চুঁইয়ে বেরোচ্ছে। শুধু ১৯৭৯ নয়, সম্ভবত আরো আগে থেকেই। আর, পেন্‌সিলভানিয়া তো 'জগতের উদ্যান' নামেই পরিচিত! এইখানেই আসে নতুন ভাবনা। নিউ ইয়র্ক শহর থেকে হ্যারিসবার্গ মাত্র ১৮০ মাইল দূরে। ট্যাঙ্ক: হ্যারিস্‌বার্গের নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টার। তেজস্ক্রিয় পদার্থে দূষিত জল প্রথমে ঐ রিঅ্যাক্টারেই জমা হয়েছিল। আকাশচুম্বী অট্টালিকার শহর নিউ ইয়র্ককে 'ফাঁপা পর্বতের পথ' বলার মধ্যে এক কাব্যিক সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে। চারশো বছর আগেকার এক মানুষের কাছে

জবাবদিহি করার দায় থেকে গেছে ‘থ্রি মাইল আইল্যাণ্ড’ কর্তৃপক্ষের।

তিন নম্বর খ্রীষ্টবিরোধীর কথায় আসার আগে এটুকু বলে নিতে হল। নিউ ইয়র্কের ওপর আক্রমণ দিয়ে শুরু হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আর সেই বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বালাবে কে? নস্ত্রাদামু তার আঁধার ঘরে, আলোর বিচ্ছুরণের মধ্যে, কোন অচেনা কণ্ঠস্বরে অথবা অস্পষ্ট ছবি বা শব্দের গহনে দেখেছিল সেই ভয়ঙ্কর মানুষকে—অ্যালিয়ুস্ বা ম্যাবিয়ুস্‌কে।

ম্যাবিয়ুস্ শীঘ্রই মারা যাবে, তারপর শুরু হবে মানুষ ও জীবজন্তুর ভয়ঙ্কর ধ্বংসকাণ্ড। অকস্মাৎ উদ্ঘাটিত হবে প্রতিহিংসা, শত শত হাত এগিয়ে আসবে, ধূমকেতুর অতিক্রমকালে দেখা দেবে পিপাসা আর বুভুক্ষা।

১৯৮৬ সালে হ্যালির ধূমকেতুর আগমন প্রত্যক্ষ করেছে পৃথিবী। এই ধূমকেতুর কথা প্রায়ই এসেছে মিশেল দ্য নস্ত্রাদামুর ভবিষ্যৎকথনে। এখানেও যেন তারই প্রতিধ্বনি। অন্য কোন নাম কি শব্দের হেরফেরে অ্যালিয়ুস্ বা ম্যাবিয়ুসে পরিণত হয়েছে? মনে রাখা দরকার, নস্ত্রাদামু ছিলেন প্রথিতযশা চিকিৎসক। মানুষ আর জীবজন্তু উভয়কেই মৃত্যুমুখে ঠেলে দিতে সক্ষম, এমন কোন রোগ তখনও পুরোপুরি অজানাই ছিল। এটা তাঁর না-জানার কথা নয়। প্লেগের কথা বাদ দেওয়া যায়, কারণ প্লেগে মানুষ ছাড়া মারা যায় ইঁদুর। ইঁদুরকে নিশ্চয়ই তিনি ‘‘জীবজন্তুর’’পর্যায়ভুক্ত করেননি। তাহলে? মানুষ আর জীবজন্তু একই সঙ্গে ধ্বংস হবে কিসে? নিউক্লিয়ার ফল্‌আউট? পৃথিবীর সৌভাগ্য—অতিক্রান্ত হয়েছে ১৯৮৬ সাল, অনন্ত মহাশূন্যে ফিরে গেছে হ্যালির ধূমকেতু। ফলআউট নয়, কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ করেছি চের্নোবিলের ভয়ঙ্কর ধ্বংসকাণ্ড। সারা পৃথিবী মুখর হয়েছে চের্নোবিলের আলোচনায়, প্রতিবাদে।

তার হাত শেষ পর্যন্ত যাবে খুনে অ্যালিয়ুসের মধ্যে দিয়ে, নিজেকে সে সমুদ্রের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। দুটি নদীর মধ্যে সে ভয় পাবে সামরিক হাতকে, কালো এবং ক্রুদ্ধজন তাকে তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করতে বাধ্য করবে।

দুটি চতুষ্পদীতেই ফিরে ফিরে এসেছে একটা শব্দ—হাত। কার হাত? ক্রুইজ মিসাইল, পার্শিং-২, মাল্‌টিপ্‌ল্ ইণ্ডিপেণ্ডেন্টলি রি-এণ্ট্রি ভেহিক্‌ল্ যারা নিয়ন্ত্রণ করে—তাদের? আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ বা রাশিয়ার মিখাইল গর্বাচেভ কি তৃতীয় খ্রীষ্টবিরোধীর সঙ্গে কোনভাবে সম্পর্কযুক্ত?

আরেকটা চতুষ্পদীতে ক্রুইজ মিসাইল চুক্তির ছাপ পাওয়া যায়:

লণ্ডনের প্রধানমন্ত্রী আমেরিকান শক্তির সাহায্যে স্কটল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জে এক ঠাণ্ডা জিনিস চাপিয়ে দেবে। "পোলার" (Polar)। রয় রেব্ এক ভয়ঙ্কর খ্রীষ্টবিরোধী হিসেবে কাজ করবে এবং সমস্যায় ফেলবে তাদের সকলকে।

শুধু গ্রীন্‌হ্যাম কমন্-এই ক্রুইজ মিসাইল বসানো হয়নি। ক্রুইজ আর পার্শিং-২-এর ঘাঁটি বানানো হয়েছে স্কটল্যাণ্ডেও। তবে, ঐ ঠাণ্ডা জিনিস, বা 'পোলার' বলতে নস্ত্রাদামু হয়ত হ্যারল্ড ম্যাক্‌মিলানের 'পোলারিস'-এর কথাও বুঝিয়ে থাকতে পারেন।

কৃষ্ণসাগর এবং তাতার দেশের ওপার থেকে এক রাজা আসবে ফ্রান্স পরিদর্শনে। অ্যালানিকা আর আর্মেনিয়ার মধ্যে দিয়ে যাবে সে, বাইজান্‌টিয়ামে রেখে যাবে তার ঘাতক দণ্ড।

তাতার দেশের ওপর, অর্থাৎ, সেই রাজা আসবে রাশিয়া থেকে। তাতার দেশের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সমগ্র মধ্য এশিয়া। সেখানে, ককেশাসের উত্তরে অ্যালানিয়া আর দক্ষিণে আর্মেনিয়া। হয়ত সেই 'রাজা' বা দ্বিগ্বিজয়ী পারস্যের মধ্যে দিয়ে বল্‌কান্ অঞ্চলে পৌঁছবে—এমনটাই বুঝেছিলেন ভবিষ্যদ্বক্তাদের রাজা। তাতার দেশ পেরিয়ে অবশিষ্ট থাকে শুধু এশিয়া। ফ্রান্স সংক্রান্ত অন্য একটা চতুষ্পদীতেও ঐ 'ঘাতক দণ্ড'-বিশিষ্ট মানুষের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত, কোন ধরনের অস্ত্রের কথাই বোঝাচ্ছে ঐ দণ্ড। এবং—এশিয়া! তিন নম্বর খ্রীষ্টবিরোধীর সঙ্গে এশিয়া সম্পর্ক আবারও পাওয়া যায়:

দীর্ঘদিন প্রতীক্ষা সত্ত্বেও সে আর কখনো ফিরবে না ইউরোপে,

সে আবির্ভূত হবে এশিয়াতে। মহান হ্যামীজ্ প্রদত্ত এক মৈত্রী, প্রাচ্যের অন্য সব শক্তিকে ছাপিয়ে যাবে সে।

হ্যামেটিক্ সাহিত্যে হ্যামীজ্ হচ্ছে জুপিটার আর মার্কারির প্রতিনিধিস্বরূপ। সাধারণ ভাবে এর অর্থ হল ইসলাম। আগের দুই খ্রীষ্টবিরোধী, নেপোলিয়ঁ আর হিটলার, ইওরোপের লোক। কিন্তু, নস্ত্রাদামু বলছেন, আর সে ফিরবে না ইওরোপে। তৃতীয়জন আবির্ভূত হবে এই এশিয়াতে। মধ্যপ্রাচ্য, আফগানিস্তান, কুর্দিস্তান, ওদিকে ইথিওপিয়া, শাদ, লেবানন, ইরাক, ইরান—দুর্যোগের ঘনঘটা। এই কুয়াশা ভেদ করেই বুঝি বেরিয়ে আসবে সেই ধ্বংসকর্তা। তবে এই মুহূর্তে প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ বলতে সারা পৃথিবী চেনে একটিই দেশকে : চীন।

বিরাট হালকা অশ্বের যুদ্ধ যখন হবে, তখন দাবি করা হবে যে মহান অর্ধচন্দ্র ধ্বংস হয়ে গেছে। রাত্রিকালে হত্যা করার জন্য, মেষপালকের পোশাক পরে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরবে, গভীর পরিখায় রক্ত লাল গর্ত।

মহান অর্ধচন্দ্র! মনে পড়া স্বাভাবিক যে অর্ধচন্দ্র এক মুসলিম প্রতীক। অশ্বের যুদ্ধ, রাত্রিকালে হত্যা, গভীর পরিখা—সবকিছুর মধ্যেই স্পষ্ট যুদ্ধের ইঙ্গিত। আগের চতুষ্পদীটিতেও ইসলামের ছায়া, এটিতেও তাই। তৃতীয় খ্রীষ্টবিরোধী কি তাহলে মুসলিমদের মধ্যে থেকেই বেরিয়ে আসবে?

কখন আসবে যুদ্ধ? এর আগে আমরা দেখেছি, ১৯৯৯ সালকে চিহ্নিত করেছেন নস্ত্রাদামু। নস্ত্রাদামুর নানান কথায় ইঙ্গিত মেলে—১৯৮৬ থেকে ১৯৯৯ সাল হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময়কাল। এক জায়গায় তিনি লিখছেন :

কাস্তে যখন ধনুরাশির পুষ্করিণীতে মিলিত হবে, তখন তা হবে এর তুঙ্গলগ্ন। প্লেগ, দুর্ভিক্ষ সামরিক হাতে মৃত্যু। শতাব্দী অগ্রসর হবে তার নবজন্মের দিকে।

'কাস্তে' এখানে দুটো অর্থ বোঝাতে পারে : প্রথমটা শনির

জ্যোতির্বিজ্ঞানগত অর্থ, অথবা রুশীয় প্রতীক—কাস্তে বা হাতুড়ি! পুষ্করিণী—জলাধার, অর্থাৎ কুম্ভরাশি। তাহলে দাঁড়ায়, শনি যখন ধনুরাশির তুঙ্গে তার সঙ্গে সংযোগ ঘটাবে, তখনই আসবে এক মহাসমর। সহচর ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু। তবে, এ ভবিষ্যদ্ববাণীতে কিছু গলদ চোখে পড়ে। কুম্ভর সঙ্গে কখনোই ধনুর সংযোগ ঘটে না। তাহলে—কাস্তে-হাতুড়ি? রাশিয়া?

যুদ্ধ বা এক ভয়াবহ পরিণতির পূর্বগামী হিসেবে দেখা দেবে বেশ কিছু ভূমিকম্প—বলেছেন নস্ত্রাদামু। সর্বনাশের ইঙ্গিত।

সূর্য যখন বৃষরাশির কুড়ি ডিগ্রীতে যাবে তখন ঘটবে এক ভূমিকম্প। জনাকীর্ণ বিরাট শহর যাবে ধ্বংস হয়ে। বাতাসে, আকাশে ও মাটিতে অন্ধকার আর উত্তেজনা, মস্তিষ্ক তখন অস্বীকার করবে ঈশ্বর আর সন্তদের।

মূল ফরাসীতে রয়েছে — Sol vingt de Tauras, অর্থাৎ সূর্য বৃষরাশির রাশিচক্রগত চিহ্নে প্রবেশের কুড়ি দিন পর। দিনের হিসেবে দাঁড়ায় ১০ মে। সালের উল্লেখ আমরা পাই না। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে কোন জনবহুল শহর। মনে রাখা দরকার, শুধু ১৯৮৩ সালেই বিভিন্ন ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ছিল ৬ হাজারেরও বেশি। ভূমিকম্প-বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছে মারাত্মক ভূমিকম্পের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে। তাঁরা বলেছেন, ১৯৮৭ সালের কাছাকাছি কোন সময়ে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হতে পারে ক্যালিফোর্নিয়ায়। নস্ত্রাদামুর সময়ে, ষোড়শ শতাব্দীতে, আমেরিকা এক প্রায়-অজানা ভূখণ্ড। অথচ, তাঁর কথা ছুঁয়ে গেছে ঐ অঞ্চলকেও। বিশেষজ্ঞরা এমন কথাও বলছেন যে ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রবল ভূমিকম্প হলে তা সুদূর নিউ ইয়র্কেও অনুভূত হবেই। এ প্রসঙ্গে আরও মনে রাখা দরকার, ১৯৯১ সালে আমরা দেখেছি ইরাকের সঙ্গে আমেরিকাসহ ২৪টি দেশের যুদ্ধ আর ঠিক তার পরপরই আমাদের প্রতিবেশী পাকিস্তানে ঘটে গেছে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প।

ভূমিকম্প নয়, তবে প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে একটা ঘটনার উল্লেখ এখানে করা যায়। ১৪ নভেম্বর, ১৯৮৫ লাতিন আমেরিকার কলম্বিয়ার আরমেরো অঞ্চল সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিল এক সর্বনাশা ধ্বংসকাণ্ড। জেগে উঠেছিল নেভাদো দেল্ রুইজ আগ্নেয়গিরি। অগ্ন্যুৎপাত, লাভাস্রোত। উত্তপ্ত

কাদায় ভরে গিয়েছিল আরমেরো। মারা গিয়েছিল হাজার হাজার মানুষ। প্রায়-ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল আরমেরো সেদিন। ভূমিকম্প নয়, কিন্তু এক বৃহত্তর ধ্বংসকাণ্ডের পূর্বাভাস হয়তো! ১৯৯১ সালে বিধ্বংসী অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে জাপানে।

আচ্ছা, নস্ত্রাদামুর হিসেব মতো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি ১৯৯৯ সালের মধ্যেই হয়, তাহলে একবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে পৃথিবীর অবশিষ্ট জীবিত মানুষের জীবনে কি নেমে আসবে কোন শান্তির যুগ, নতুন কোন আশা! না। মিশেল দ্য নস্ত্রাদামু আমাদের কাছে কোন আশার আলোকরেখা পাঠাননি। বড় অন্ধকার যেন শুধু অন্ধকারটুকুই দেখতে পেতেন ঐ ভবিষ্যদ্বক্তাদের রাজা। অথবা, সবটুকু অন্ধকার বলেই হয়তো তিনি অন্ধকারই দেখতেন শুধু!

> **অনেক দুর্দশার পরও মানবজাতির সামনে আসবে বৃহত্তর দুর্দশা, যখন শতাব্দীর বিপুল যন্ত্রের পুনর্জন্ম ঘটবে। রক্ত ও দুগ্ধের বৃষ্টি হবে, দেখা দেবে দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ ও ব্যাধি। আকাশে দেখা যাবে এক আগুন, ল্যাজে করে যে টেনে নিয়ে যাবে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।**

ঘটনা, তারিখ, সময় নির্ধারণের জন্য সে যুগে ধূমকেতুর অসীম কদর ছিল। বিশেষত, ভবিষ্যতের দিনক্ষণের ক্ষেত্রে। নস্ত্রাদামুর ইঙ্গিতময় চতুষ্পদীগুলোতেও ধূমকেতুর প্রভাব একান্ত স্পষ্ট। এখানেও, ঐ শেষ কথাগুলো নিশ্চিতভাবেই ১৯৮৬ সালে হ্যালির ধূমকেতুর আগমনকেই বোঝাচ্ছে। রক্ত-বৃষ্টির অর্থ আজকের মানুষের বুঝতে খুব অসুবিধে হয় না। হিরোসিমায় পরমাণু বোমা নিক্ষেপের পর বেশ কয়েকদিন ধরে আকাশ থেকে ঝরে পড়েছিল বড় বড় কৃষ্ণবর্ণ বৃষ্টিফোঁটা। অনেক দুর্দশা পেরিয়েও পৌঁছনো যাবে না কোন সবুজ তটভূমিতে। শতাব্দীর বিপুল যন্ত্রের যখন পুনর্জন্ম ঘটবে, বিংশ শতাব্দী অতিক্রম করে পৃথিবী পা রাখবে একুশ শতকের বুকে, তখনও মিলবে না কোন সবুজের দেখা। কোথাও কোন দ্বীপ নেই, দিগন্তে চোখ রেখে মানুষ বলতে পারবে না—নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ, প্রবাল দিয়ে ঘেরা, শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে সাগর-বিহঙ্গেরা। একুশ শতকের মানুষকেও সাক্ষী হতে হবে দুর্ভিক্ষের, যুদ্ধের, ব্যাধির। মানুষের মুক্তি কোথায়? কত দূরে?

তৃতীয় খ্রীষ্টবিরোধীর কথা বলতে গিয়ে এবার এক অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ভবিষ্যদ্বাণী শোনানো যাক, যেখানে হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে আমাদের এই ভারতবর্ষের ছবিও :

খুব শীঘ্রই খ্রীষ্টবিরোধী হত্যা করবে ঐ তিনজনকে, সাতাশ বছর ধরে চলবে তার যুদ্ধ। অবিশ্বাসীদের হত্যা করা হবে, বন্দী করা হবে, নির্বাসন দেওয়া হবে ; রক্ত, মানবদেহ, মাটির বুকে ছড়িয়ে থাকবে লাল জলের দাগ।

ঐ তিনজন! কোন্ তিনজন ?

'প্রফেসিজ' সংক্রান্ত চিঠিপত্রে নস্ত্রাদামু বারবার জোর দিয়ে তিনজন খ্রীষ্টবিরোধীর কথা বলেছেন। কিন্তু এই 'তিনজন'কে হত্যা করবে নিঃসন্দেহে তিন নম্বর খ্রীষ্টবিরোধী। হিটলারের পর, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, একই পরিবারের তিন তিনজন মানুষ পৃথিবীতে পরিচিত হয়েছে, ক্ষমতা পেয়েছে—কারা ? এই মুহূর্তে দুটো ছবিই সামনে আসে।

প্রথম ছবির পটভূমিকা আমেরিকা, এবং পরিবারটি সুবিখ্যাত কেনেডি পরিবার। প্রথম কেনেডি, প্রেসিডেন্ট জন কেনেডি, নিহত হন আততায়ীর গুলিতে। দ্বিতীয়জন তাঁর ভাই রবার্ট কেনেডি। জ্যেষ্ঠের পথের সাথী হতে হয়েছিল রবার্টকেও, ছুটে এসেছিল আততায়ীর গুলি। তৃতীয়জন আজও জীবিত—এডওয়ার্ড কেনেডি। নস্ত্রাদামুর ভবিষ্যৎদর্শন সত্য হলে, রেহাই নেই এডওয়ার্ডেরও। নস্ত্রাদামুর অন্য আরেকটি চতুষ্পদীর ব্যাখ্যা করলে বোঝা যায়, এই তৃতীয়জন, সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি, কোনদিনই ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছতে পারবেন না। বাস্তবে এডওয়ার্ড তাঁর দুই জ্যেষ্ঠের থেকে অনেকখানি পিছিয়ে। জনমানসে তাঁর প্রভাব দুর্বল।

আর দ্বিতীয় ছবি ? সে ছবি এই দেশের, ভারতবর্ষের। এ দেশের ক্ষমতার শীর্ষে দীর্ঘদিন থেকেছে একটি পরিবার—গান্ধী পরিবার ! জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী। না, জওহরলাল আততায়ীর হাতে নিহত হননি। কিন্তু, অনুপুঙ্খের বিচারে, জওহরলাল গান্ধী-পরিবারের সদস্য নন। গান্ধী-পরিবারের দুজন এসেছেন ক্ষমতায়। প্রথমজন নিহত, আততায়ীর গুলিতে। এখন রাজীব। নস্ত্রাদামু কি রাজীবের জন্যও কোন রক্তাক্ত অন্ধকারের ইঙ্গিত দিয়েছেন ? এবং, এ প্রসঙ্গে মনে এলেও আসতে পারে আরেকটি নাম : সঞ্জয় গান্ধী। ক্ষমতার অত্যন্ত কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন

সঞ্জয়। রাজীব তখনও বৃত্তের বাইরে। কিন্তু ক্ষমতায় পৌঁছনো আর হয়ে ওঠেনি সঞ্জয়ের। বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ দিতে হয়েছিল তাঁকে। মেনে নিচ্ছি—দুর্ঘটনাই। আততায়ীর গুলি নয়। তবু, পরিণতিটা একই। এই সঙ্গে, কেনেডি পরিবার আর গান্ধী পরিবারের আর একটা হিসেব মেলানো যাক। বয়সে জ্যেষ্ঠ জন কেনেডি প্রেসিডেন্ট ছিলেন, বয়সে জ্যেষ্ঠ ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। মধ্যম রবার্টও ক্ষমতার শিখরে যেতে পারেননি, কিন্তু প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী রবার্টের জয়লাভের সম্ভাবনা ছিলো একান্ত উজ্জ্বল। এই ভারতে বয়সে মধ্যম রাজীব প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন। কনিষ্ঠ এডওয়ার্ড ক্ষমতা থেকে অনেক দূরে, কনিষ্ঠ সঞ্জয় শীর্ষে আরোহণ করতে পারেননি।

এই প্রসঙ্গে শেষ কথাটা বলে ফেলা যায়। ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছতে পেরেছিলো কেনেডি পরিবারের একজন মাত্র। গান্ধী পরিবারের দুজন সদস্য প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। পাল্লাটা কাদের দিকে ভারী?

(ওপরের কথাগুলো ছিল এ বইয়ের ১৯৮৮ সালের প্রথম সংস্করণে। তৃতীয় সংস্করণের সময় দেখছি, মিলে গেছে হিসেব। ১৯৯১-এর ২১ মে রাতে আততায়ীর বোমায় নিহত হয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী!)

সাতাশ বছরের যুদ্ধের কথা আছে চতুষ্পদীটিতে। ভিয়েতনামের কথা ছেড়ে দিলে ভেসে ওঠে মধ্যপ্রাচ্যের ছবি, আফ্রিকার ছবি। অনুমান ছাড়া এ ক্ষেত্রে উপায় নেই। এমনটাও হতে পারে যে নিউক্লিয়ার যুদ্ধের পর মোটামুটি নিরাপদ অঞ্চলে পরিণত হতে পৃথিবীর সাতাশ বছর সময় খরচ হয়ে যাবে। কিন্তু তখন, মানুষ কি থাকবে? আজ, এই মুহূর্তে, পৃথিবীতে আক্রমণ প্রতিআক্রমণে নিউক্লিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে, কোন প্রাণীরই বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই। আমাদের এই 'ছোট্ট' গ্রহটাকে বহুবার ধ্বংস করার মত পরমাণু বোমা সাজিয়ে রেখেছে শক্তিধররা, তাদের সাধের অফুরান ভাঁড়ারে।

কোন্ দেশের ইঙ্গিত দিয়েছেন মিশেল দ্য নস্ত্রাদামু, সেটা অনুমানের বিষয়। কিন্তু একটা ঝোঁক আছে আফ্রিকার দিকে—

পৃথিবী এগিয়ে চলেছে তার অন্তিম ক্ষণের দিকে। শনির প্রত্যাবর্তন আবার বিলম্বিত হবে। সাম্রাজ্য সরে যাবে এক কৃষ্ণবর্ণ দেশের দিকে...

প্রভাঁসের প্রাচীন ভাষায় Brodde শব্দের অর্থ কালো বা গাঢ় বাদামী। স্বভাবতই মনে পড়ে আফ্রিকার কথা। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সঙ্গে আফ্রিকার আজ নানান সম্পর্ক। 'সাম্রাজ্য' শব্দটা নির্দেশ করতে পারে উগাণ্ডায় ইদি আমিনের কুখ্যাত শাসন, অথবা সম্রাট আঙ্গ পাতাসে বোকাসাকে। অত্যাচারে নেপোলিয়ঁকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল বোকাসা। কিংবা, এ চতুষ্পদী হয়তো জিম্বাবোয়ের কথা বলতে চাইছে। নির্দিষ্ট জায়গাটা অনুমানের স্তরেই থাকছে। বড় ভয়ংকর কথা বলেছেন নস্ত্রাদামু—পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে তার অন্তিম ক্ষণের দিকে। আফ্রিকা কি তার অগ্রদূত?

যুদ্ধ প্রসঙ্গে নস্ত্রাদামু সাধারণ যে চিত্র দিয়েছেন, তাতে দেখা যায়—দুটি বৃহৎ শক্তি ঐক্যবদ্ধ হবে তৃতীয় একটি শক্তির বিরুদ্ধে। তবে, ঐ দুই শক্তির ঐক্য দীর্ঘস্থায়ী হবে না। আজকের পৃথিবী দুটি বৃহৎ শক্তিকেই চেনে আমেরিকা, রাশিয়া। এই দুই শক্তির ঐক্য? অসম্ভব—আজকের দৃষ্টিতে। অথচ, নস্ত্রাদামু অবিরাম এক প্রাচ্যদেশীয় খ্রীষ্টবিরোধীর কথা বলেছেন। সত্যি সত্যি যদি এই নেপোলিয়ঁ-হিটলারের উত্তরসূরী উঠে আসে প্রাচ্যের মাটি থেকে, তাহলে? ভাবতে অসুবিধে হলেও, সেরকম পরিস্থিতিতে কিন্তু রুশ-মার্কিন সমঝোতা একেবারে অসম্ভব নয়। তবে, সে সমঝোতাও সাময়িক।

নস্ত্রাদামু বলছেন:

> উত্তর মেরুর লোকেরা যখন ঐক্যবদ্ধ হবে, তখন পূর্বাঞ্চলে (East) দেখা দেবে দারুণ ভীতি আর আতঙ্ক। নির্বাচিত হবে এক নতুন নেতা, তার সমর্থনে থাকবে এক মহান ব্যক্তি যে কম্পিত হবে। বর্বরদের রক্তে রঞ্জিত হবে রোড্‌স্‌, বাইজান্টিয়াম্‌।

এর পরেও কিছু আছে। ভবিষ্যতের পৃথিবীর, যুদ্ধের, আরও কিছু ছবি দেখেছেন নস্ত্রাদামু:

> শাসন থাকবে দুজনের হাতে, অতি অল্পদিনই বজায় থাকবে সেই শাসন। তিন বছর আর সাত মাস পরে তারা [বাধ্য হবে] যুদ্ধে যেতে। দুই অনুচর বিদ্রোহ করবে তাদের বিরুদ্ধে: তারপর আমেরিকার মাটিতে জন্ম নেবে বিজেতা।

আগের চতুষ্পদীতে এক মৈত্রীর কথা বলা হয়েছে। তার সঙ্গে এই

দ্বিতীয় চতুষ্পদীটির কোন সম্পর্ক যদি থাকে, তাহলে বুঝতে হয় মাত্র তিন বছর সাত মাস স্থায়ী হবে বিশ্বশান্তি, তারপর তারা বাধ্য হবে যুদ্ধের মাঠে নামতে। অনুচর বা আজ্ঞাবহ দেশ দুটি কোন্ কোন্ দেশ, বলা অসম্ভব। কিন্তু নস্ত্রাদামু স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, জয় হবে পাশ্চাত্যের, আমেরিকার। রুশ-মার্কিন মৈত্রীর সূত্রে গ্লাসনস্ত জমানার কথাটাও মনে পড়তে বাধ্য। আর নানান আভ্যন্তরীন সমস্যায় যেভাবে বিব্রত হতে হচ্ছে রাশিয়াকে, যেভাবে তার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, তাতে আমেরিকার জয়ের ইঙ্গিত সত্যিই তো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে প্রতিদিন।

দুই শক্তির মৈত্রীর প্রসঙ্গ আবার ফিরে এসেছে, তারই সঙ্গে এসেছে সেই 'রক্তমাখা মানুষ'-এর কথা।

দুই বিরাট নেতা একদিন বন্ধুতে পরিণত হবে। বেড়ে উঠবে তাদের বিপুল ক্ষমতা। নতুন দেশটি পৌঁছবে তার ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে : সংখ্যার হিসাব নেবে রক্তমাখা মানুষটি।

শুনতে বড় অদ্ভুত লাগে : দুই শক্তি, দুই বিরাট নেতা পরিণত হবে মিত্রতে! অমেরিকা আর রাশিয়া, শত্রুতা নেই, বন্ধুত্বে আবদ্ধ! ঐক্যবদ্ধ হলে তাদের ক্ষমতা তো বাড়বেই, বাড়বে অস্বাভাবিক মাত্রায়। নতুন দেশ বলতে, নস্ত্রাদামুর সময়ের চোখে, নিঃসন্দেহে আমেরিকাকেই বোঝায়। কিন্তু সেই 'রক্তমাখা মানুষ' তার নিজের আর দুশমনের ক্ষমতার শীর্ষবিন্দু হিসেবে কোন্ সময়টাকে বেছে নেবে? তার নিজের কাছে, নিজের বিশ্বাসের কাছে, ঠিক কখন বিপজ্জনক হয়ে উঠবে ঐ শত্রু? আর, ইরাকি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনের সঙ্গে রক্তমাখা মানুষটির কোন সম্পর্ক থাকতে পারে কি?

পৃথিবী আজ ভারী হয়ে উঠেছে মারণাস্ত্রের বোঝায়, 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস।' জমে উঠছে ক্রুইজ মিসাইল, পার্শিং-২, নিউট্রন বোমা। ঘটনাটা পাশ্চাত্যের পক্ষে খুব মঙ্গলজনক নয়। এত অস্ত্র, এত রণসম্ভার, আর তার মালিক পশ্চিমী দুনিয়া এই প্রাচ্যভূমিকে টেনে নিয়ে যাবে যুদ্ধের ময়দানে—বলছেন নস্ত্রাদামু।

পাশ্চাত্যে প্রস্তুতি হবে সেই ভয়ংকর যুদ্ধের, পরের বছর দেখা দেবে মহামারী : সেই তরুণ হবে অত্যন্ত ভয়ানক, বৃদ্ধ বা পশু কেউই [বাঁচতে পারবে না] রক্ত থেকে, আগুন থেকে, ফ্রান্সে

দেখা দেবে বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পতি।

মহামারী, অসংখ্য মৃত্যু, রক্ত, আগুন—ভাবতে ভয় হয়, ইঙ্গিতটা বোধহয় নিউক্লিয়ার ফল্‌আউটের!

বিংশ শতাব্দীর এ কোন্ ছবি চোখের সামনে? ক্লান্তি নামে এরিকা শিথ্যামের বিভ্রান্ত শরীরে। যুদ্ধ, নির্মমতা, পাশবিকতা, দুর্ভিক্ষ, বিপর্যয়, মৃত্যুর মহাপ্লাবন। পৃথিবীর অধীশ্বররা, একটু থমকে দাঁড়াও, জন্ম যদি তব বিশ্বে তিষ্ঠ ক্ষণকাল। একবার ভাবো, শুধু একবার চোখ মেলো এই গ্রাম-নগরের ভীড়ে। এ কোন্ অন্ধকার তোমরা জমিয়ে তুলছো আমাদের বুকের ওপর! হয়তো সুযোগ আছে এখনও, থামাও এ মরণখেলা, মারণ-খেলা! পৃথিবীটা তোমাদের হোলিখেলার লীলাক্ষেত্র নয়! এবং, ঐ তিন নম্বর খ্রীষ্টবিরোধী!

নস্ত্রাদামু—কোথাও শান্তির কথা নেই তার, উদ্দীপ্তিও নেই; একদিন মৃত্যু হবে, জন্ম হয়েছে; সূর্য উদয়ের সঙ্গে এসেছিল খেতে; সূর্যাস্তের সঙ্গে চলে গেছে।

ভাবনার গভীরে এরিকা। ভেবে চলেছে—বৈশাখের মাঠের ফাটলে / এখানে পৃথিবী অসমান। / আর, কোন প্রতিশ্রুতি নেই।

৮

একা মোর গানের তরী

তারপর মিশেল ফিরে এলো নিজের চৌহদ্দীতে। অ্যান্, ছেলেমেয়েরা, শ্যাভিনি। দ্বিতীয় ফ্রান্সিস তার পক্ষে দাঁড়িয়েছে।

অ্যান্ বলে, 'কি দরকার বাপু ওসব রাজারাজড়ার কথায় থাকার। ওদের কি মতিগতির ঠিক আছে!'

মিশেল বলে, 'কিন্তু আমার লেখায় ওদের কথা রয়েছে যে!'

'থাকুক গে। জিজ্ঞেস করলে বলবে, ওগুলোতে রাজাদের কথা বলিনি, ওর অন্য মানে আছে।'

শ্যাভিনি হেসে ওঠে, 'মসিয়ঁর এখন যা খ্যাতি, তাতে ওসব কথা বললে

লোকে বিশ্বাসই করবে না।'

ব্যাজার হয়ে ওঠে অ্যান্, 'আর এই এক ভ্যালা সাকরেদ জুটেছে। যা ভালো বোঝো করো।'

সুখ বরাতে সয় না। সুখের ফুলের মাঝে কোথাও লুকিয়ে থাকে সোহাগী কাঁটা। চুপিচুপি কখন এসে হাজির হয় পায়ে পায়ে। মানুষের শরীর থেকে তখন অনেক রক্ত ঝরে পড়ে অনাবিল।

১৫৬০ সালের নভেম্বর মাস। 'ছায়া ঘনাইলো বনে বনে।' তরুণ রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিস আচ্ছন্ন হলেন কোমায়।

দ্বিতীয় ফ্রান্সিসের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল স্কটল্যাণ্ডের রানী মেরী স্টুয়ার্টের। পঞ্চম জেম্‌সের কন্যা মেরী বাবার মৃত্যুর পর মা মেরী দ্য গিজ্-এর সঙ্গে বসবাস করছিল ফ্রান্সের রাজপ্রাসাদে। অতঃপর, ফ্রান্সিসের সঙ্গে বিয়ে।

তরুণ রাজা মৃত্যুশয্যায়। রাজসভার প্রতিটি মানুষের নজর তখন মিশেল দ্য নস্ত্রাদামুর ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে। ভেসে উঠছে 'প্রফেসিজ্'-এর দশম শতকের ৩৯-তম চতুষ্পদীটি :

প্রথম সন্তান, বিধবা, সন্তানহীন এক দুঃখজনক বিবাহ। দুটি দ্বীপের মধ্যে বিরোধ। আঠারো বছর বয়সের আগেই, এক নাবালক : অন্যজনের বাগ্‌দান হবে আরও অল্পবয়সে।

দ্বিতীয় ফ্রান্সিস আর মেরী স্টুয়ার্টের বিবাহ প্রসঙ্গ এখানে স্পষ্ট। দুঃখজনক বিয়েই বটে। কোন সন্তানও হয়নি ওদের। মেরীর স্কটল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে বিরোধ দেখা দিয়েছিল ইংল্যাণ্ড আর স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে। আঠারো বছরের আগেই! মৃত্যুর সময় ফ্রান্সিসের বয়স কত হয়েছিল? নিখুঁত হিসেবে—সতেরো বছর দশ মাস পনেরো দিন! আর ঐ অন্যজন হচ্ছে ফ্রান্সিসের ছোট ভাই নবম চার্লস। আরো অল্প বয়সে তার বাগ্‌দানের কথা বলেছিল মিশেল। অস্ট্রিয়ার এলিজাবেথের সঙ্গে যখন বাগ্‌দান হয় চার্লসের, তখন এই ফরাসী রাজকুমারের বয়স মাত্র এগারো বছর!

এর পরেও লোকের নজর পড়বে না? ডিসেম্বরের শুরুতে টাস্‌ক্যানির রাজদূত নিকোলো তর্নাবুয়োনি ফ্লোরেন্সের ডিউক কসিমোকে লিখলেন : 'রাজার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু বলা যাচ্ছে না। আর, এ মাসের পূর্বাভাস দিতে গিয়ে নস্ত্রাদামু বলেছেন, কোন এক অজানা ব্যাধিতে

রাজপরিবারের দুজন তরুণ সদস্যের মৃত্যু হবে।’

দ্বিতীয় ফ্রান্সিস কবে মারা গেলেন? না, ধারাবাহিকতায় কোন গরমিল ঘটেনি। তরুণ রাজার জীবনদীপ নিভেছিল ঐ ডিসেম্বরেরই ৫ তারিখে! কিন্তু, মিশেল দ্য নস্ত্রাদামু যে দুজন তরুণ সদস্যের মৃত্যুর কথা বলেছে! বুঝি ঐ নিষ্ঠুর ভবিষ্যদ্বক্তার কথার সত্যতা রক্ষা করার জন্যই, ডিসেম্বর মাসেই, শেষবারের মতো নিঃশ্বাস ফেলল রোশ্-সুর-ইয়ঁতে বসবাসকারী ফরাসী রাজপরিবারের ছোট তরফের নাবালক উত্তরাধিকারীটি। নস্ত্রাদামু জীবনের কথা বলে না, জীবনের সাঁঝ-পিদিম জ্বালানোর ইঙ্গিত দেয় না। সে বলে শুধু জীবনের সীমানা পেরিয়ে সেই আঁধার জগতের কথা, যন্ত্রণার, রিক্ততার, মৃত্যুর কথা।

অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল মিশেলের খ্যাতি, বা, সঠিক অর্থে, কুখ্যাতি। ফ্রান্সে বসবাসকারী স্পেনীয় রাজদূত শ্যান্তোনে ১৫৬১-র জানুয়ারী মাসে লিখলেন তাঁর রাজা দ্বিতীয় ফিলিপকে: ‘মানুষ দেখেছে যে এক মাসের মধ্যে রাজপরিবারের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সদস্যটি মারা গেছে। এইসব বিপর্যয় স্তম্ভিত করে দিয়েছে রাজসভাকে। একই সঙ্গে তাদের স্তম্ভিত করে দিয়েছে নস্ত্রাদামুর সতর্কবাণী। ভবিষ্যদ্বাণীগুলো বেচতে না দিয়ে এই লোকটিকে বরং শাস্তি দেওয়া উচিত। এইসব ভবিষ্যদ্বাণী লোককে যতসব বাজে আর কুসংস্কারময় বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।’ সে মাসে ভেনিসীয় রাজদূত সুরিয়ানো তার দেশের প্রধান বিচারকের কাছে লিখলেন: ‘ফ্রান্সে এখন আরেকটা ভবিষ্যদ্বাণী দারুণ ছড়িয়ে পড়েছে। সেই বিখ্যাত দিব্যশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী নস্ত্রাদামুর লেখাতেই এই ভবিষ্যদ্বাণীটা পাওয়া গেছে। ঐ ভবিষ্যদ্বাণীতে তিন ভাইয়ের সকলেরই বিপদের কথা বলা হয়েছে, বলা হয়েছে যে রানী তাঁর তিন ছেলেকেই রাজা হতে দেখবেন।’

‘চিঠি এসেছে বাবা, চিঠি—’ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকল সেজার; মিশেল আর অ্যানের প্রথম সন্তান। এখন ওর বয়স ঠিক বারো বছর। চারিদিকে বাবার কত নাম-ডাক, লোকে তার বাবাকে রীতিমত সমীহ করে চলে। বালক সেজার খুশি হয়, গর্বে ফুলে ওঠে বুক—হ্যাঁ, বাবার মত বাবা বটে আমার! কিন্তু বাবা যে ঠিক কী করে, তা যেন বুঝে উঠতে পারে না বালকটি। শুধু একটা আবছা রহস্যের গন্ধ পায়।

‘কার চিঠি, দেখি।’ হাত বাড়িয়ে দেয় অ্যান্। আবার কোন্ ফ্যাচাং এলো হয়ত। চিঠিখানা খুলল ও।

চিঠি পাঠিয়েছেন অরেঞ্জের বিশপ। রৌপ্যনির্মিত একটি সুদৃশ্য পানপাত্র চুরি গেছে। ব্যাপারটাতে বড় উদ্বিগ্ন বিশপ। জানতে চান—কে সেই চোর? কোথায় পাওয়া যাবে হারানো পানপাত্র? মিশেলের কাছে সাহায্য চেয়েছেন বিশপ।

'অ্যায়, জানি ঠিক কোন ফ্যাচাং-ট্যাচাং এসেছে। নাও, এবার উদ্ধার করো পেয়ালাখানা। লোকে পারেও বটে বাপু। ভারি একটা পেয়ালা খোয়া গেছে, তো রাজ্যিময় হুলুস্থুল। হুঁ:!' গজগজ করে অ্যান্।

'আরে, চটো কেন? সব সময় কি মাথা গরম করলে চলে? আর বিশপ বলে কথা! কি হে শ্যাভিনি, তুমি কী বলো?' সাক্ষী খোঁজে মিশেল।

শ্যাভিনি ঠোঁটের কোণে হাসে, 'বিশপের অনুরোধ তো আর অগ্রাহ্য করা যায় না!'

'ঠিক, এই হল বুদ্ধিমানের কথা—' চিঠিখানা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে মিশেল। গন্তব্য ছাদের সেই ঘর। ঐ ঘরে একলা হয়ে কিছু অদৃশ্য ছবি দেখতে হবে ওকে। বাবাকে ওপরতলায় যেতে দেখে সেজার আর পা বাড়ায় না। ও-ঘরে কিছু একটা রহস্য আছে—ছোট্ট সেজার বোঝে।

অরেঞ্জের বিশপের হাতে পৌঁছল নস্ত্রাদামুর উত্তর। চিঠির শুরুতে একটা কোষ্ঠী আঁকা, কিন্তু তার কোনরকম ব্যাখ্যা দেওয়া নেই। তারপর বলা হয়েছে—সত্বর ঐ পানপাত্র খুঁজে না পেলে অরেঞ্জে দেখা দেবে ভয়ঙ্কর মহামারী, আর সেই তস্করের বরাতে জুটবে এক আতঙ্কজনক মৃত্যু। সেই সঙ্গে বিশপকে জানিয়েছে নস্ত্রাদামু—তার চিঠিখানা যেন কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকে দেওয়া হয় (নস্ত্রাদামুর এই চিঠি আজও সংরক্ষিত আছে আর্লসের মহাফেজখানায়)।

কিন্তু নস্ত্রাদামুর এই কথাগুলোর প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল, তা আজ আর জানার কোন উপায় নেই। বিশপ ঐ চিঠি টাঙিয়েছিলেন কি না, তার ফল কী হয়েছিল—কোথাও তার কোন নথিভুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আর একটা ঘটনার কথা বলা যাক। এবং আবার বলে রাখা যাক, হয়ত এটাও সেই অতিকথা, অপ্রামাণিক গল্প। কিন্তু মিশেল দ্য নস্ত্রাদামুর, পৃথিবীর তাবৎ ভবিষ্যদ্বক্তার মধ্যে যিনি রাজার সম্মান পেয়েছেন, তাঁর তৎকালীন প্রসিদ্ধির পরিচিতি ছড়িয়ে আছে এই কাহিনীতে।

ফ্রান্সের শরীরে তখন নেমে আসছে সাঁঝের আঁধার। ঘরপানে ডানা মেলেছে জানা-অজানা পাখির ঝাঁক। একটু ঠাণ্ডার ছোঁয়া। ঘরের ভিতর

মন মানেনি মিশেলের। এসে বসেছে বাড়ির দুয়ারে। চোখে উদাসী আভাস, যেন এই ফ্রান্সের, পৃথিবীর, কোন সাঁঝ দেখছে ও। আলো ফুরিয়ে আসছে পৃথিবীতে, ক্লান্ত মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে চার দেয়ালের আচ্ছাদন।

তখন এগিয়ে চলেছে এক কিশোরী। সামনে, কিছুদূর এগিয়ে, আছে এক বনানী। কিশোরী চলেছে সেই বানানীমুখী।

মেয়েটি মিশেলের পরিচিত। এখানে মিশেলের কিছু বন্ধু-বান্ধব আছে। তেমনি এক বন্ধুরই মেয়ে এই কিশোরী। মিশেলের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে মেয়েটি। বাবার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল ও। চোখ তুলে বন্ধুকন্যাকে দেখল মিশেল। মেয়েটি বলল, 'শুভসন্ধ্যা, মসিয়ঁ নস্ত্রাদামু।'

'শুভসন্ধ্যা, ছোট্ট মেয়ে।'

হাসতে হাসতে চলে গেল মেয়েটি। উদাসী চোখে তার চলে যাওয়াটুকু দেখল মিশেল। বনের মধ্যে মিশে গেল কিশোরী। কোন ছবি কি দেখল মিশেল।

হয়ত, দেখল।

খানিক পরে বন থেকে বেরিয়ে এল কিশোরী। অন্ধকার তখন প্রায় চেপে বসেছে। সেই আলো-আঁধারে ও দেখল, রহস্যময় মানুষটি তখনও বসে আছে দরজার সামনে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মিষ্টি হেসে মেয়েটি বলল, 'শুভসন্ধ্যা, মসিয়ঁ নস্ত্রাদামু।'

উত্তর এল, যেন অনেক দূর থেকে, 'শুভসন্ধ্যা, ছোট্ট নারী।'

চমকে উঠল মেয়েটি। নারী? যাওয়ার সময় তাকে 'ছোট্ট মেয়ে' বলেছিলেন পিতৃবন্ধু, এখন বললেন 'ছোট্ট নারী'। তাহলে...তাহলে কি উনি জেনে ফেলেছেন তার প্রথম অভিসারের কথা? আজ সে প্রথম পুরুষসঙ্গ পেয়েছে, শরীরে তার এই প্রথম অনাবিল সুখের আবেশ। ঐ রহস্যময় মানুষ কি সেটা বুঝে ফেলেছেন? উদাসীন নস্ত্রাদামুর মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল কিশোরী। আজ আর সে অনাঘ্রাতা কুমারী নয়!

হয়ত নিছক গল্প, অতিকথা। বা, হয়ত মেয়েটিকে একাকী ঐ বনের মধ্যে যেতে দেখে স্বাভাবিক অনুভূতিতেই মিশেল বুঝতে পেরেছিল—কী ঘটতে চলেছে।

বুদ্ধিদীপ্ত কোন মানুষের পক্ষে তার সমকালীন পরিস্থিতিকে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে, রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক অবস্থা, আন্তর্জাতিক চিত্র বিচার

করে, নিকট ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব। ঘটনাপ্রবাহের বিবর্তনের একটা নিজস্ব নিয়ম আছে, প্রয়োজন সেই নিয়মটুকু আত্মস্থ করা। কিন্তু, নিজের সমকাল পেরিয়ে, এক-দুই-তিন-চারশো বছর পরের পৃথিবী সম্পর্কে প্রায়-নিখুঁত কোন ইঙ্গিত দেওয়াটা এই নিয়মের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে না। শুধু ইঙ্গিতই নয়, বহুক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মানুষের নাম, তারিখ, স্থান ও ঘটনা পর্যন্ত উল্লেখ করা—স্বাভাবিক হিসেবে একে ঠিক মেলানো যায় না। মেলানো যায় না তাই নস্ত্রাদামুকে।

নস্ত্রাদামুর লেখা থেকে সময় নির্ণয় করা সম্বন্ধে একটা কথা মনে রাখা দরকার। চতুষ্পদীগুলোতে এক বিশেষ ধরনের ভাষা প্রয়োগ করেছেন তিনি। তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় কতকগুলো 'ট্রিগার ওয়ার্ডস', অর্থাৎ চাবিকাঠি, সঙ্কেতের জট ছাড়ানোর কেন্দ্রবিন্দু। এই শব্দগুলোর সঠিক বিশ্লেষণ থেকেই বেরিয়ে আসে সঠিক সময়-কাল। যেমন আমরা দেখেছি নেপোলিয়ঁর ক্ষেত্রে। নেপোলিয়ঁর উদ্ভবের আগে পর্যন্ত ফ্রান্সকে অভিহিত করা হত 'রাজ্য' নামে। আর নেপোলিয়ঁর সময় থেকেই ফ্রান্স পরিচিত হয় 'সাম্রাজ্য' নামে, যেখানে শাসন করে এক সম্রাট—রাজা নয়। প্রথম খ্রীষ্টবিরোধী নেপোলিয়ঁর কথা বলতে গিয়ে নস্ত্রাদামুর 'ট্রিগার ওয়ার্ড' ঐ সাম্রাজ্য শব্দটাই। এই ধরনের নিখুঁত ইঙ্গিতময় কয়েকটা চতুষ্পদী দেখা যাক।

প্রত্যাখান করা হয়েছিল যে নারীকে, ফিরে আসবেন তিনি ক্ষমতায়; তাঁর শত্রুদের খোঁজ মিলবে চক্রান্তকারীদের মধ্যে। আগেকার থেকে অনেক বেশি জয়োল্লাস আসবে তাঁর আমলে; তিন এবং সত্তরে মৃত্যু হবে নিশ্চিত।

(ষষ্ঠ শতক, ৭৪-ম চতুষ্পদী)

শাসনক্ষমতায় এক নারী, এবং তাঁর মৃত্যু হবে তিন ও সত্তরে। কে? পৃথিবীর জমা-খরচের খাতায় হিসেব মেলাতে গেলে ইংল্যাণ্ড অধিশ্বরী প্রথম এলিজাবেথের নামটাই ফুটে ওঠে। ঠিক ৭০ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন রাণী এলিজাবেথ, আর সালটা ছিল ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ! শৈশবে এলিজাবেথ প্রত্যাখ্যাতই ছিলেন। জ্যেষ্ঠা ভগ্নী মেরী টিউডর-এর শাসনকালে নাবালিকা এলিজাবেথের বিরুদ্ধে প্রচুর চক্রান্তের সাক্ষ্য দেয় ইতিহাস। তাছাড়া, প্রথম এলিজাবেথের শাসনকাল ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল যুগ। কেউ কেউ আবার এ চতুষ্পদীতে খুঁজে পেয়েছেন ইন্দিরা গান্ধীর

ছবি। ক্ষমতায় এসেছিলেন ইন্দিরা, ক্ষমতা হারিয়েওছিলেন, তারপর আবার ফিরে এসেছিলেন স্বমহিমায়। তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তও হয়েছে বিস্তর, শেষপর্যন্ত নিহতও হয়েছেন তিনি। ৬৭ বছর বয়সে মারা গেছেন ইন্দিরা। সত্তর থেকে তিন বাদ দিলে ৬৭ হয়। ইঙ্গিতটা কি সে দিকেই।'

'ডেকার্স অ্যাল্‌মানাখ্‌' নামে কুখ্যাত এক অপ-রাসায়নিক গ্রন্থকে পোপ অষ্টম আর্বান নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে। জন্‌ডী, ওয়াল্টার র‍্যালের মত ইংরেজ জ্যোতির্বিদদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল ডেকার্স অ্যাল্‌মানাখ্‌। নস্ত্রাদামু লিখেছেন :

> **জ্যোতিষীদের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে যাবে। তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে, ঘোষণা করা হবে নিষিদ্ধ বলে এবং তাদের বইপত্র সেন্সর করা হবে—১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে। এ কাজ করবে পবিত্র পরিষদ, ফলে কেউই রেহাই পাবে না ঐ পবিত্র লোকদের হাত থেকে।**

আমাদের চোখে এই ভবিষ্যদ্বাণীর মূল্য হয়ত তেমন কিছু নয়, কিন্তু স্বয়ং মিশেল নস্ত্রাদামুর কাছে এর তাৎপর্য ছিল অসীম। নিজে তিনি জ্যোতিষী, ভবিষ্যৎ জ্যোতিষীদের এই পরিণতির কথা ভাবতে নিশ্চয়ই অনেক যন্ত্রণা পেতে হয়েছিল তাঁকে। আর—মিলিয়ে নিন সালটা। একেবারে 'ষাঁড়ের চোখে' (bull's eye) আঘাত করেছেন নস্ত্রাদামু—১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ!

পোপ সংক্রান্ত আর একটা ভবিষ্যদ্বাণীতে ১৬০৯ সালের কথা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে সালটা একেবারে নির্ভুল নয়, তবে মনোযোগ আকর্ষণ করার পক্ষে যথেষ্ট।

> **১৬০৯ সালে, বছরের শুরুতে, রোমান যাজকমণ্ডলীকে নেতা বাছাইয়ের জন্য এক নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। ক্যাম্পানিয়া থেকে আসবে এক ধূসর আর কালো জন, তার মত দুষ্ট আর কেউ আগে আসেনি।**

পোপ পঞ্চম পল্‌ ভ্যাটিকানে ক্ষমাসীন ছিলেন, ১৬০৫ থেকে ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। প্রথম বিচারে তাই মনে হয়—ভবিষ্যদ্বাণীটা বেঠিক। একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক। পোপ পঞ্চম পল্‌ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন ১৬০৯ সালে। এইবার, তৎকালীন চিঠিপত্র ও নানান রিপোর্ট নাড়াচাড়া করলে

একটা তথ্য হাতে আসে। পোপ অসময়ে মারা যাবেন কি না, তা নিয়ে বিস্তর কৌতূহল, এমনকি চক্রান্ত ছড়িয়ে পড়েছিল ফ্রান্স আর রোমের রাজসভায়। তথ্যটা একটা ইঙ্গিত দেয়ই। ধূসর সন্ন্যাসী বলতে ফ্রান্সিস্‌কান এবং কালো বলতে বেনডিক্‌টাইনদের কথাই বুঝতে দেয়। দুটি সম্প্রদায়েরই তখন যথেষ্ট রাজনীতিক মর্যাদা ছিল।

আরও আছে। নিখুঁতভাবে বছরের উল্লেখ করে ভবিষ্যতের আরও হরেক ছবি লিখেছেন নস্ত্রাদামু।

লণ্ডনে ঝরবে নির্দোষীদের রক্ত, আগুনে পুড়বে তারা তিন কুড়ি ছয় সালে। নিজের উচ্চ অবস্থান থেকে পতিত হবেন প্রাচীন মহিলা, আর ঐ একই গোষ্ঠীভুক্ত আরও বহুজন নিহত হবে।

এ চতুষ্পদীর অর্থ বুঝতে গিয়ে প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে সাল লেখা হত সহস্র নির্দেশক সংখ্যাটি বাদ দিয়ে। অর্থাৎ—১৬৪১-কে লেখা হত ৬৪১, ১৭২২-কে লেখা হত ৭২২। সেই সময়কার কবরখানাগুলোয় যে-সব স্মৃতিফলক বসানো হত, তাতে আজও এইভাবে লেখা সালের হদিশ পাওয়া যায়। এই চতুষ্পদীতে বলা হয়েছে তিন কুড়ি আর ছয় সাল। তিন কুড়ি, মানে ষাট; আর ছয় অর্থাৎ ছেষট্টি। লণ্ডনের সমগ্র ইতিহাসে কোনো '৬৬ সালে আগুন লাগার কথা পাওয়া যায়? যায়। ১৬৬৬ সালে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল লণ্ডনে। প্রাচীন মহিলার পতনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সেন্ট পল্‌স্ ক্যাথিড্রাল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ঘটনায়। ধ্বংস হয়েছিল আরো বহু ক্যাথলিক চার্চ। চারিদিকে আগুনের বর্ণময় প্রাণঘাতী খেলা। অসহ উত্তাপ। নিজেদের কাঠের বাড়ি থেকে বেরিয়ে লোকেরা সেদিন আশ্রয় নিতে ছুটেছিল প্রস্তরনির্মিত গির্জাগুলোতে। কিন্তু সেই প্রচণ্ড অগ্নিময় উত্তাপ রেহাই দেয়নি পাথুরে গির্জাভবনকেও। নির্দোষীদের রক্ত ঝরবে কথাটায় সম্ভবত বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে ঐ-সব সাধারণ মানুষের ঐভাবে মারা যাওয়ার কোন কারণ ছিল না।

'প্রফেসিজ'-এর তৃতীয় শতকের ৭৭-তম চতুষ্পদীটিতে শুধু বছরই নয়, উল্লেখ পাওয়া যায় মাসেরও।

মেষের অন্তর্গত তৃতীয় জলবায়ুতে, ১৭২৭ সালের অক্টোবর

মাসে, পারস্যের রাজাকে বন্দী করবে ঈজিপ্টের রাজা : যুদ্ধ, মৃত্যু, ক্ষতি : ক্রুশের প্রচুর ক্ষতি।

মিশেল দ্য নস্ত্রাদামুর মৃত্যুর ঠিক ১৫৯ বছর পরের ঘটনা। ১৭২৭ সালের অক্টোবর মাসে এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তুরস্ক আর পারস্যের মধ্যে। ঈজিপ্ট ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, তাই তুরস্ক বোঝানোর জন্য একটু ঘুরিয়ে ঈজিপ্টের নামটা ব্যবহার করেছেন নস্ত্রাদামু। ক্রুশ, অর্থাৎ খ্রীশ্চিয়ান ধর্ম। ঐ চুক্তির ফলে খ্রীশ্চিয়ান ধর্মের ক্ষতি হয়েছিল বৈকি! নিজের সাম্রাজ্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিবর্তে পারস্যের তৎকালীন শাহ্ আশরাফ তুরস্কের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এম্ভান্, তুরিস আর হামদান, এবং তুরস্কের সুলতানকে খলিফা পদের বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। এই ঘটনার পর খ্রীশ্চিয়ান চার্চ আর কোন ক্রুসেড্ বা ধর্মযুদ্ধ চালাতে পারেনি। ইতিহাসের গতিপথে অতঃপর শক্তিসঞ্চয় করে গেছে অটোমান সাম্রাজ্য।

পুরনো সেই দিনের কথা থাক এখন। আমার ফিরে আসি নিজেদের শতাব্দীতে। এই বিংশ শতাব্দী, আমাদের ঘরের কাছের আরশিনগর। আরশিনগরে বাস করে এক অচিন পড়শি, তাকে আমরা দেখি না কোনদিন। আজ মিশেল নস্ত্রাদামুর আলোয় চোখ ফেলা যাক আরশিতে, দেখা যাক সেই পড়শিকে এই যুগকে, আমাদের নিজেদেরকে।

৯

বিংশ শতাব্দীর যাদুঘরে

বেশি দূরে যাবো না। ক্লান্ত হয়ে কী লাভ! আলো হাতে চোখ রাখি বিংশ শতাব্দীর চল্লিশ থেকে আশির দশকের শরীরে।

রাত্রিকালে রামধনু উঠবে নান্তেস্-এর কাছে, নৌ-শিল্প বৃষ্টি সৃষ্টি করবে। আরবীয় উপসাগরে ডুবে যাবে বিরাট নৌবহর। এক ভল্লুক আর শূকরী স্যাক্সনিতে জন্ম দেবে এক দানবের।

বৃষ্টিকে সৃষ্টি করা হবে। চল্লিশের দশকে, ১৯৪৭ সালে, কৃত্রিম বৃষ্টি নির্মাণের কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। নাস্তেসের কাছে রামধনু দেখা দেবে, এবং সেই সময়ই বিপর্যয়ের মুখে পড়বে কোন নৌবহর। বিপর্যয়টা কোথায় ঘটবে? আরবে কোন প্রকৃত উপসাগর নেই। তাহলে থাক দক্ষিণে লোহিত সাগর আর আরব সাগর, অথবা পূর্বে পারস্য উপসাগর। চতুষ্পদীটা যেন ইঙ্গিত করছে—এই অঞ্চলে বেশ বড়সড় নৌশক্তি ঘোরাফেরা করবে। ইরান আর ইরাকের মধ্যে সংঘর্ষের ইঙ্গিত? নাকি সাম্প্রতিক ইরাক-আমেরিকা যুদ্ধের ইশারা? দানবটা কে?

দ্বিতীয় শতকের ৮১-তম চতুষ্পদী:

আকাশ থেকে নেমে আসা আগুনে পুড়ে প্রায় ধ্বংস হয়ে যাবে শহর, জল আবার বিপন্ন করবে মিউক্যালিয়ঁকে (খুব সম্ভবত ডিউক্যালিয়ঁ)....

আমাদের ভবিষ্যতের ছবি। বীভৎস মৃত্যু। আকাশ থেকে নেমে আসা আগুন, শহর ধ্বংস: কামানের গোলা নিশ্চয়ই নয়। এ যুগের কোন মারণাস্ত্র, বা বলেই ফেলা যায়, পারমাণবিক অস্ত্র। এই চতুষ্পদীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায় দ্বিতীয় শতকের ৬-নং চতুষ্পদীটিকে, যেখানে ভেসে উঠেছে হিরোশিমা-নাগাসাকি:

বন্দরের কাছাকাছি এবং দুটি শহরে নেমে আসবে দুটি শক্তিদায়ী যন্ত্র, এরকম জিনিস আগে কখনো দেখা যায়নি। ক্ষুধা, আভ্যন্তরীণ মহামারী, লৌহদ্রব্যের [তরবারি?] দ্বারা নিক্ষিপ্ত মানুষরা মহান অবিনশ্বর ঈশ্বরের কাছে আর্তকণ্ঠে সাহায্য চাইবে।

১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট। জাপান। সমুদ্রের ধারে হিরোশিমা শহর। পৃথিবীর বুকে আঘাত হানলো প্রথম পারমাণবিক বোমা (পরীক্ষামূলকভাবে অবশ্য তার কয়েকদিন আগেই অন্যত্র পরমাণু বোমা ফাটানো হয়েছিল)। বিস্ফোরণ, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ। পৃথিবীর বৃহত্তম গণমৃত্যুর সাক্ষী হল হিরোশিমা। ৯ আগস্ট বোমা পড়লো আর এক সাগর ছোঁয়া শহর নাগাসাকিতে। একই ছবি দেখলো পৃথিবী। হিরোশিমা-নাগাসাকির আগে ধ্বংসের এত বড় দানব পৃথিবীর ইতিহাসে আসেনি। বিকিরণকে চিহ্নিত

করা হয়েছে 'আভ্যন্তরীণ মহামারী' (মূলে peste অর্থাৎ প্লেগ আছে) হিসেবে। নস্ত্রাদামুর সময়ে দক্ষিণ ফ্রান্সের বৃহত্তম মহামারী ছিল প্লেগ। এই মহামারী অভিহিত হত 'শার্বঁ' (Charbon) নামে। ফরাসী ভাষায় 'শারবঁ' মানে কয়লা। প্লেগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সর্বাঙ্গ ভরে যেত বড় বড় কালো ফুস্কুড়িতে। তেজস্ক্রিয় বিকিরণও মানুষের সর্বাঙ্গে কালো কালো দাগ বসিয়ে দেয়। জাপানে এইসব মানুষদের বলা হয় 'হিবাকুশা'। আর চতুষ্পদীর শেষ পঙক্তিটা তো কোন ব্যাখ্যারই অপেক্ষা রাখে না।

পঞ্চম শতকের ৯০-তম চতুষ্পদীতেও একই বিপদের ইঙ্গিত। ঘটনাটা এখনও ঘটেনি। সুস্থ জীবনপ্রেমী প্রতিটি মানুষ মনে-প্রাণে চাইবে—এ ঘটনা যেন না ঘটে, যেন মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় নস্ত্রাদামুর ভবিষ্যৎকথন। চতুষ্পদীটি থেকে বেরিয়ে আসে যে গ্রীস বা বলকান অঞ্চলের কোথাও নিক্ষিপ্ত হবে একটা পরমাণু বোমা। আর এ ঘটনার সঙ্গে ভালরকম যোগাযোগ থাকবে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার।

সাইক্লেড্স্, পেরিন্থিয়াস্ ও লারিসায়, স্পার্টায় এবং সমগ্র পেলোপনেশাসে : অতি বৃহৎ দুর্ভিক্ষ, নকল [অর্থাৎ, মনুষ্যসৃষ্ট] ধূলির ফলে প্লেগ। গোটা উপদ্বীপে ন মাস স্থায়ী হবে এটি।

'নকল ধূলি'—বস্তুটা কী? বারুদ, প্লেগ, মহামারী—এসব তো জানাই ছিল নস্ত্রাদামুর। অর্থাৎ তার থেকে বেশি কিছুই বোঝাতে চাইছে ঐ নকল ধূলি। নিউক্লিয়ার ফলআউট?

মিশেল নস্ত্রাদামুর ভবিষ্যদ্বাণীর গহন অরণ্যে সূর্য পৌঁছয় না, তাই ছেয়ে থাকে অন্ধকার। একটুও কি আলো নেই কোথাও? এতটুকু আশার আভাস? বিষণ্নতার অণুবীক্ষণে ক্লান্ত চোখ রেখে দেখতে দেখতে হয়তো একবার ঝিকমিকিয়ে উঠবে ষষ্ঠ শতকের ২৪-তম চতুষ্পদীটি—

মঙ্গল এবং রাজদণ্ডের সংযোগ ঘটবে : কর্কটের প্রভাবে এক দুর্দশাময় যুদ্ধ : তার কিছুদিন পর অভিষিক্ত হবে নতুন এক রাজা যে দীর্ঘদিনের জন্য পৃথিবীতে নিয়ে আসবে শান্তি।

শান্তি!

মিশেল দ্য নস্ত্রাদামু অবশেষে আমাদের শুনিয়েছেন শান্তির ললিত বাণী।

ভাবতে ভাল লাগে—ব্যর্থ পরিহাস এটা নয়। তবে যুদ্ধ অপরিহার্য। যুদ্ধের পর শান্তি। দীর্ঘদিনের শান্তি। আমাদের শ্বাস ফেলার অবসর, জীবন-চাখার সুযোগ। কিন্তু, অন্তত বিশ্বযুদ্ধের নিরিখে, পৃথিবী তার দীর্ঘতম 'শান্তি' যে দেখেই ফেলেছে—১৯৪৫-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান থেকে শুরু করে ১৯৯০, পঁয়তাল্লিশটা বছরব্যাপী 'বিশ্বশান্তি'! ভাবা যাক, এই তথাকথিত শান্তির কথা বলেননি ভবিষ্যদ্বক্তাদের রাজা, বলেছেন আমাদের ভবিষ্যতের কথা। ভাবা যাক, আবার কোন-এক অবশ্যম্ভাবী মারণযুদ্ধের পর, রণক্লান্ত, দীর্ণ ধরিত্রীর বুকে ছায়া পড়বে কোন পাখির ডানার—স্নিগ্ধ, মিষ্টি ছায়া। বেঁচে-থাকা মানুষের বুক শীতল হবে। আর, খুব সম্ভবত, রাজদণ্ড বলতে বোঝানো হয়েছে বৃহস্পতিকেই। সেক্ষেত্রে, বৃত্তের মাঝখানে এসে হাজির আমাদের এই ১৯৯০-এর দশক। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি তাহলে মঞ্চস্থ হবে এই দশকের রঙ্গমঞ্চেই? মনে রাখুন, নস্ত্রাদামুর হিসেব অনুযায়ী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটতে চলেছে ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যেই!

> **সূর্যোদয়ের কালে দেখা যাবে প্রকাণ্ড আগুন, শব্দ আর আলো অগ্রসর হবে উত্তরের দিকে। পৃথিবীর [ক্ষেত্রের] মধ্যে মৃত্যু এবং ক্রন্দনরোল; অস্ত্র, আগুন ও দুর্ভিক্ষে মৃত্যু অপেক্ষা করছে তাদের জন্য।**

কী পাওয়া যায়? উত্তর গোলার্ধের কোন-এক দেশে ভোরবেলা বোমা পড়বে। এই উত্তর দিকের ইঙ্গিতটা প্রায়ই ফিরে ফিরে এসেছে নস্ত্রাদামুর রচনায়। বোমাবর্ষণের পর এক বিরাট ধ্বংসের যুগ। আমেরিকাই জয়ী হবে শেষে—প্রথম শতকের ৯২তম চতুষ্পদীতে বলেছেন নস্ত্রাদামু। কিন্তু সেই সঙ্গেই ইঙ্গিত দিয়েছেন—এক বৃহত্তম ধ্বংসকাণ্ড ঘটে যাবে আমেরিকাতেও।

আবার একটু আশারশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে দ্বিতীয় শতকের ১৯-তম চতুষ্পদীতে।

> **নবাগতরা গড়ে তুলবে এমন এক স্থান যেখানে প্রতিরক্ষা থাকবে না, এমন এক স্থানে তারা বসবাস করবে যা তখনও পর্যন্ত বাসযোগ্য ছিল না। তৃণভূমিতে, গৃহে, মাঠে, শহরে আনন্দে থাকবে সকলে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও যুদ্ধ, সুবিস্তীর্ণ চাষযোগ্য জমি।**

আশা এখানে স্পষ্ট। সবচেয়ে বড় কথা, মিশেল নস্ত্রাদামু 'আনন্দের' কথা বলেছেন! মানুষ আনন্দে থাকবে—সর্বত্র! চাষের জন্য থাকবে দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে-থাকা অহল্যাভূমি। তবে, নিরঙ্কুশ নয়, দুর্ভিক্ষ মহামারী যুদ্ধ—ওটুকু ছাড়া যাচ্ছে না!

মাটি ছেড়ে আকাশ, মহাশূন্য।

মারাত্মক মহামারী তরঙ্গের [প্রভাবে] বিরাট এক দুর্ভিক্ষ নিজের দীর্ঘায়িত বৃষ্টিকে প্রসারিত করবে উত্তরমেরু পর্যন্ত। সামারোব্রিন্, ভূ-গোলার্ধ থেকে একশত লীগ্ দূরে : আইন ছাড়াই বেঁচে থাকবে সেগুলি, থাকবে রাজনীতি থেকে দূরে।

সামারোব্রিন্! শ্লাভির রুশ ভাষায় সামোরোব্রিন্ শব্দটা গঠিত হয় দুটো শব্দ দিয়ে : সামো অর্থাৎ স্বয়ং, রোবিন্ অর্থাৎ চালক। স্বয়ংচালক! ভূ-গোলার্ধ থেকে একশত লীগ্ বা প্রায় সাড়ে তিনশো মাইল দূরে এক স্বয়ংচালক। কে? মনুষ্যহীন স্বয়ংক্রিয় উপগ্রহ! সোভিয়েত যুদ্ধবিমানগুলোকে সাময়লট্ বলা হয়। অর্থাৎ স্ব-উড্ডয়ন, নিজে থেকে উড়তে পারা। বৃষ্টি এখানে পারমাণবিক সংক্রমণের দ্যোতক হতে পারে। এবং—আবার উত্তরমেরু। বিংশ শতাব্দীর এই শেষভাগে মহামারী বলতে এড্‌সকেও ভাবা যেতে পারে। এড্‌স্ চিকিৎসার দুটি সহায়ক ওষুধ সুমারিন আর রিবাভিরিন। দুটো মিলে শব্দটা সামারোব্রিন-এর প্রায় সমতুল্যই দাঁড়ায়।

নিজেকে সে নিয়ে যাবে লুনার এক প্রান্তে, তারপর আটকা পড়বে এবং পা রাখবে অচেনা এক দেশে। অপক্ক ফলটি বিপুল কুৎসার, বিপুল নিন্দার শিকার হবে; আবার বিপুল প্রশংসারও শিকার হবে সে।

লাতিন শব্দ লুনা। লুনা মানে চাঁদ। প্রথম যে দুজন নভশ্চর, নীল আর্মস্ট্রং আর এড্‌উইন্ অল্‌ড্রিন্, পা রেখেছিল চাঁদের মাটিতে, তারা তো প্রথম ছুঁয়েছিল এক অচেনা দেশকেই। চাঁদ, মানুষের ইতিহাসের সাক্ষী, বড়-চেনা বড়-অচেনা। অপক্ক ফল বলতে ভাবা যায় অ্যাপোলো ১৩-র কথা। রকেটে গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল। নভশ্চররা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছিলেন পৃথিবীর

শরীরে ফিরে আসার। আর তখন সত্যি অর্থেই ছড়িয়ে পড়েছিলো নানান কুৎসা, নিন্দা, এবং পাশাপাশি অনেক প্রশংসাও।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের শক্তিকেন্দ্রের কি কোন পরিবর্তন ঘটবে? সেরকম একটা ইঙ্গিত চোখে পড়ে অষ্টম শতকের ৮১-তম চতুষ্পদীতে :

বিষণ্ণ নতুন সাম্রাজ্য সরে যাবে উত্তরমেরু থেকে।

বিজ্ঞানী মহলে কেউ কেউ বলছেন—ভয়ঙ্কর কোন পারমাণবিক যুদ্ধ ঘটলে তুলনামূলক ভাবে নিরাপদ স্থান হবে দক্ষিণ মেরু, ফক্‌ল্যাণ্ডের মতো জায়গা। কারণ সমুদ্র, ঝোড়ো বাতাস—এগুলো কিছুটা রক্ষাকবচের কাজ করবে। আগে জেনেছি—জয় এসে হাত ধরবে আমেরিকার। হোয়াইট হাউস তাহলে কী করবে? সদরদপ্তর সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কোন এক দ্বীপের নিরালা-নির্জন পাহাড় চূড়ায় বসে পৃথিবী জয়ের বিষথাবা বাড়াবে!

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রসঙ্গে বেশ কিছু ইঙ্গিত আছে 'প্রফেসিজ্'-এ, কয়েকটা দেখা যাক :

গড়ে উঠবে এক বিশাল ইংরেজ সাম্রাজ্য, তিনশত বছরেরও বেশি তারা থাকবে সর্বশক্তিমান। স্থলপথ আর সমুদ্রপথে অতিক্রম করবে বিপুল শক্তি। খুশি হবে না পর্তুগীজরা।

ষোড়শ শতাব্দীর বাসিন্দা মিশেল দ্য নস্ত্রাদামু। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ড একটা রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠলেও স্পেন, ফ্রান্স বা রোমান সাম্রাজ্যের মত শক্তি বা সম্পদ তার ছিলো না। কিন্তু, ইতিহাস জানে ঐ ইংল্যাণ্ডই হয়ে উঠেছিলো দুনিয়ার অধীশ্বর, সর্বশক্তিমান। তিনশো বছরের কথা পাওয়া যাচ্ছে ভবিষ্যদ্বাণীতে। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক ভাষ্যকার হিসেব শুরু করেছেন প্রথম এলিজাবেথের সময় থেকে আর শেষ করেছেন ভিক্টোরিয়ার আমল পর্যন্ত এসে। অর্থাৎ সাড়ে তিনশ বছরের মত দাঁড়ায় হিসেবটা। স্থল ও সমুদ্রপথের বিষয়টা স্পষ্ট। ইংরেজ আধিপত্যে পর্তুগীজরা নিশ্চয়ই খুশি হয়নি (স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশও হয় নি)। আর হ্যাঁ, এই চতুষ্পদীটাই 'প্রফেসিজ্'-এর সর্বশেষ চতুষ্পদী : দশম শতকের ১০০-তম চতুষ্পদী।

তৃতীয় শতকের ৫৭-তম ভবিষ্যদ্বাণীতে বিষয়টা আরেকটু স্পষ্ট :
সাতবার পরিবর্তন ঘটতে দেখা যাবে, ব্রিটিশ জাতির, দুই শত নব্বই বছর তারা সিক্ত হবে রক্তধারায়। জার্মানি সংযোগের দ্বারা আদৌ মুক্ত হবে না, পোল্যাণ্ডের শাসকদের সামনে বিপদ হাজির করবে মেষ।

সমস্যাটা হল—ঐ দুশো নব্বই বছরের কড়-গোনাটা শুরু হবে কোথা থেকে? সাতটা দারুণ পরিবর্তনকেই বা বোঝা যাবে কী ভাবে? এরিকা শিথ্যাম্ দুভাবে চেষ্টা করেছে। প্রথমটা ১৬০৩ সালকে সূচনাবিন্দু হিসেবে ধরে নিয়ে, আর দ্বিতীয়টা প্লুটোর বার্ষিক গতি (২৬৫ বছর) অনুযায়ী। প্লুটোর চলতি বার্ষিক গতি অর্থাৎ সূর্য প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ হবে ১৯৯৫ সালে (দশম শতকের ৭২-তম চতুষ্পদীতে ১৯৯৫ সালকে এক নতুন শান্তির যুগের সূচনা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন নস্ত্রাদামু)। এই দ্বিতীয় হিসেবে এরিকা শিথ্যাম্ গণনা শুরু করেছে ১৭৬০ সাল থেকে। এই দুটো পথে হিসেব মেলাতে সুবিধে হয় ঠিকই, কিন্তু গণনাটা যেন back calculation বা জুতোর-মাপে পা-কাটার মতোই চেহারা নেয়। একটা ব্যাপার পরিষ্কার। জার্মানী সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে যখন বিব্রত থাকবে ব্রিটেন, ঠিক তখনই কোন-এক জটিল সমস্যায় জড়িয়ে পড়বে পোল্যাণ্ড। বাকিটুকু বিশ্লেষণ করার ভার থাক পাঠকের ওপর।

পাঠকের ওপর ভার থাক আরেকবার বিস্মিত হওয়ারও। তৃতীয় শতকের ১৬-তম ভবিষ্যদ্বাণী ১৯৮০-র দশকে আঘাত করেছে চাঁদমারিতে।

এক ইংরেজ যুবরাজ, যুদ্ধ তাকে নিয়ে যাবে আকাশে, নিজের উন্নতিশীল ভাগ্যকে অনুসরণ করতে চাইবে সে। দুটি দ্বন্দ্বযুদ্ধে [যুদ্ধে] তার কাছে ঘৃণিত কোন-এক ব্যক্তি বিদ্ধ করবে তার পিত্তকোষ, কিন্তু তাকে খুবই স্নেহ করবেন তার মা।

ইংল্যাণ্ডের কোন যুবরাজ রণক্ষেত্রে নিজেই দাঁড়িয়েছে অস্ত্র হাতে—এটা কি সম্ভব? সম্ভব ছিল না কিন্তু ১৯৮০-র দশক তা সম্ভব করেছে। ফক্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধে যুবরাজ অ্যানড্রুর ভূমিকার কথা মনে করুন। যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন অ্যানড্রু স্বয়ং। এবং—'যুদ্ধ তাকে নিয়ে যাবে আকাশে!'

ফক্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধে অ্যানড্রু কাজ করেছেন পাইলট হিসেবে। শেষ বিষয়টা এখনও ভবিষ্যতের আঁধারিগর্ভে।

এবার ইংল্যাণ্ড থাক। অন্যদিকে তাকাই।

লিবিয়ার যুবরাজের শক্তি থাকবে পাশ্চাত্যে, ফরাসীরা অত্যন্ত অনুরক্ত হবে আরবের ওপর; ভাষা শিক্ষা করে আরবীয় ভাষাকে ফরাসীতে অনুবাদ করতে চাইবে সে।

মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ফ্রান্সের সংযোগের কথা নস্ত্রাদামুর চিন্তায় বহুবার ফিরে ফিরে এসেছে। আর লিবিয়ার প্রসঙ্গে ভেসে ওঠে একটি মানুষের মুখ—প্রেসিডেন্ট গদ্দাফি! পাশ্চাত্যে তার প্রভাবের কথা রাজনীতির ছাত্রের অজানা নয়। কারণ—প্যালেস্তিনীয়দের সঙ্গে তার যোগাযোগ, সিরিয়ার সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি, এবং পাশ্চাত্যে তেল সমস্যা। ১৯৮৪-র শেষ দিকে শাদ্-এর ঘটনাও মনে আসে। ১৯৮৪-র নভেম্বরে স্বাক্ষরিত ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মিতেরঁর সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করেছিল লিবিয়া। অনুবাদের ব্যাপারটা বোঝা দুষ্কর। আলজিরিয়া ছিল ফরাসী উপনিবেশ। এখন সে স্বাধীন। ফরাসী-আরবীয় প্রথম শব্দকোষ প্রকাশিত হয়েছিল ১৫০৫ সালে, নস্ত্রাদামুর জন্মের ঠিক দুবছর পরে অন্য আর কোন রচনার কথা এই প্রসঙ্গে ঠিক ভাবা যায় না : ভেবে পায়নি এরিকা শিথ্যাম্। হয়তো ভাষা, রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠানের সাদৃশ্যের ইঙ্গিত এটা। উত্তর আফ্রিকায় ফরাসী প্রভাব আজও অত্যন্ত প্রকট।

লিবিয়া থেকে সাইপ্রাস :

সেই সময় সাইপ্রাস বঞ্চিত হবে ঈজিয়ান সাগর থেকে আসা সাহায্য হতে। খুন হবে বৃদ্ধরা, কিন্তু কামান ও অনুরোধে রাজা বিজিত হবেন, আরও অপমানিত হবেন রানী।

১৯৫০-এর দশকে গ্রীসের সঙ্গে মিলন ছিল সাইপ্রাসের প্রধান রাজনীতিক প্রশ্ন। সমস্যাটা আজও আছে। চতুষ্পদীটা থেকে মনে হয় গ্রীসের সঙ্গে সাইপ্রাসের কখনোই পূর্ণ মিলন হবে না, রাজা (কনস্তান্তিন ?) চালিত হবেন ভুল পথে। অপমানিত রানী হয়তো ফ্রেদেরিকা। আর ঐ 'বৃদ্ধ হত্যা' কথাটা জাগিয়ে তোলে আর্চবিশপ ম্যাকারিওস্‌কে হত্যার চেষ্টা এবং পরিণামে তাঁর মৃত্যুর স্মৃতি।

ঈশ্বর মানবজাতিকে দেখিয়ে দেবেন যে তারাই এক মহাযুদ্ধের জন্মদাতা। তার আগে আকাশে কোন অস্ত্র বা রকেট থাকবে না : বৃহত্তম ক্ষতি হবে বাঁ দিকের পক্ষের।

অস্ত্রের, রকেটের উল্লেখ বুঝিয়ে দেয়—প্রেক্ষাপট বিংশ শতাব্দী। পৃথিবীর মানচিত্রে বাঁ দিকের পক্ষ, এই শতাব্দীর যুদ্ধবাজ পক্ষ—আমেরিকা। বৃহত্তম ক্ষতি হবে তারই বিংশ শতাব্দীর পটভূমিতে এমন কোন্ যুদ্ধ ঘটেছে, যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ, পরাজিত পক্ষ আমেরিকা ? একটা নামই মনে পড়বে, পড়তে বাধ্য—ভিয়েতনাম! দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পর ছোট্ট ভিয়েতনামের ঐক্যবদ্ধ সচেতন শক্তির কাছে হার মেনে সরে যেতে হয়েছে বিশ্বাধিপতি আমেরিকাকে। সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী চরিত্রের বিরুদ্ধে বিশ্বের সচেতন মানুষের বলিষ্ঠ প্রতিরোধের ধ্রুবতারা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল ভিয়েতনাম। দিকে দিকে ভেসে উঠেছিল হাজারো কণ্ঠের দৃপ্ত জেহাদ 'তোমার নাম আমার নাম/ভিয়েতনাম, ভিয়েতনাম।' এ ছবিও হয়তো দেখেছিলেন নস্ত্রাদামু।

প্রথম শতকের ৪৭-তম ভবিষ্যৎকথন—

লেক্ জেনিভা থেকে আসা নির্দেশগুলি বিরক্তির কারণ হবে—দিন থেকে যাবে সপ্তাহে, তারপর মাসে, তারপর বছরে, তারপর সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। নিজেদের অপদার্থ আইনের নিন্দা করবেন বিচারকরা।

লেক্ জেনিভায় ছিলো লীগ্ অফ নেশন্সের দপ্তর। এই সংস্থার ক্রমান্বয় অবলুপ্তি এখানে স্পষ্ট। তার নির্দেশ মানেনি কেউ। লীগ্ অফ নেশনস্ ইতিহাসে ব্যর্থ। ১৯৪০-এর দশকে শুকিয়ে মরেছে সে।

এবার হাঙ্গেরী :

জীবনমরণের মধ্যে দিয়ে শাসন পরিবর্তন ঘটবে হাঙ্গেরীতে। ক্রীতদাসত্বের থেকেও তিক্ততর হয়ে উঠবে আইন। আর্তনাদ ও বিলাপে ভরে যাবে তাদের বিরাট শহর। রণক্ষেত্রে পরস্পরের শত্রু হবে ক্যাস্টর এবং পোলাক্স।

১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর ওয়ারশ চুক্তি অস্বীকার করেন হাঙ্গেরীর প্রধানমন্ত্রী নেগি। ৪ নভেম্বর হাঙ্গেরীর বুকে আক্রমণ নামিয়ে আনে রাশিয়ান সৈন্যবাহিনী। হাঙ্গেরীর জীবনমরণ পরিবর্তন বলতে ১৯৫৬-র ঘটনাই সামনে এসে দাঁড়ায়। পরবর্তী শাসনের কঠোরতা আজ ইতিহাস। জেমস্ মিচেনার তাঁর সুবিখ্যাত উপন্যাসে (বাংলায় 'সেতুর ওপারে মুক্তি') লিপিবদ্ধ করেছেন সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা। বহু মানুষ পালিয়েছিল পাশ্চিমী দুনিয়ায়। অধিকৃত হয়েছিল বিরাট শহর বুদাপেস্ট, তছনছ হয়ে গিয়েছিল সংগ্রামের ধাক্কায়। ক্যাস্টর আর পোলাক্সকে এরিকা শিথ্যাম্ জ্যোর্তিবিজ্ঞানের অর্থে বিচার করেনি। এরিকার কল্পনাশক্তি এখানে ফুটে উঠেছে চমৎকার ভাবে। গ্রীক পুরাণের গল্পে টিন্ডারাস্ আর লেডার যমজ সন্তান জন্মায়। দুই ভাই : ক্যাস্টর আর পোলাক্স। হাঙ্গেরীর যমজ ভ্রাতারা, রুশবিরোধী আর রুশপন্থীরা লিপ্ত হয়েছিল পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে।

দশম শতকের ২২তম চতুষ্পদীতে অন্য স্বাদ :

পরবর্তীকালে যে বিবাহবিচ্ছেদ অমর্যাদাকর বলে বিবেচিত হবে সেই বিবাহবিচ্ছেদে সম্মত হতে না চাওয়ার জন্য দ্বীপপুঞ্জের রাজা বাধ্য হবেন দেশত্যাগ করতে, এবং তাঁর জায়গায় আসবে এমন একজন যার মধ্যে রাজা হওয়ার কোন লক্ষণই নেই।

মিসেস সিম্পসন নাম্নী এক মহিলার প্রেমকে মূল্য দিতে গিয়ে ইংল্যান্ড অধীশ্বর অষ্টম এডওয়ার্ড ত্যাগ করেছিলেন রাজসিংহাসনের অধিকার। দেশের মানুষ পছন্দ করতো না মিসেস সিম্পসনকে। ঐ নারীর সামাজিক অবস্থান তাদের চোখে 'অমর্যাদাকার' ছিলো। দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন অষ্টম এডওয়ার্ড। তারপর জোর করে সিংহাসনে বসানো হয়েছিলো ষষ্ঠ জর্জকে— রাজপদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন না ষষ্ঠ জর্জ! একই প্রসঙ্গের চিত্র দশম শতকের ৪০তম চতুষ্পদীতে—

ব্রিটেনের রাজপরিবারে জাত তরুণকে তার মুমূর্ষ পিতা রাজপদের জন্য স্বীকৃতি দিয়ে যাবেন। তাঁর মৃত্যুর পর লন্ডনে বিতর্ক হবে ঐ তরুণকে নিয়ে এবং রাজত্ব কেড়ে নেওয়া হবে ঐ পুত্রের কাছ থেকে।

অষ্টম এডওয়ার্ডই ছিলেন ব্রিটিশ সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। মৃত্যুপথযাত্রী পিতা তাঁকেই চিহ্নিত করে গিয়েছিলেন ভবিষ্যৎ রাজা হিসেবে। শকুনির পাশার ছক উল্টে দিলো যুধিষ্ঠিরের হিসেব। এসে দাঁড়ালো এক নারী : মিসেস সিম্পসন। এডওয়ার্ড ডুবে গেলেন প্রেমের প্রশান্ত সাগরে। তার আগে সিম্পসনের জীবনে ঘটে গেছে একাধিক বিবাহবিচ্ছেদ। দেশের লোক মেনে নিলো না। বির্তক, বাদানুবাদ, কুৎসা। সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করলেন প্রেমিক পুরুষ। মানুষ ক্ষমতা তুলে দিলো তাঁরই ভাই ষষ্ঠ জর্জের হাতে। আমেরিকা : দশম শতকের ৭৬-তম ভবিষ্যৎ চিত্র—

মহান সিনেট্ এমন একজনের আড়ম্বর প্রত্যক্ষ করবে যাকে পরে বার করে দেওয়া হবে, যে পরাভূত হবে, তার অনুগামীরা তার বিজয়ের (জয়ভেরী) শব্দে হাজির থাকবে, বিক্রি হবে তাদের অভিজ্ঞতা, দূর হবে শত্রুরা।

ভূতপূর্ব সিনেট্ বরখাস্ত করেছিল রাষ্ট্রপতি নিক্সনকে। পাঠকের মনের পর্দায় ভেসে উঠতে পারে ওয়াটারগেট্ কেলেঙ্কারির কথা। স্বয়ং নিক্সন, আর তাঁর চেলাচামুন্ডারা 'স্মৃতিকথা' লিখেছে, বাজারে হু হু করে কেটেছে সে সব লেখা, ব্যাঙ্কব্যালেন্স স্ফীত হয়েছে তাদের। কিন্তু, ওয়াটারগেটের পরেও, পদচ্যুতির পরেও সামাজিক পুর্নবাসন পেয়ে গেছে কলঙ্কিত নায়ক— দূর হয়েছে শত্রুরা।

ষণ্ডচক্ষু (bull's eye) বিদ্ধ করেছেন নস্ত্রাদামু!

১৯৪০-এর দশক থেকে ১৯৮০-র দশক পর্যন্ত সময়কালে বিস্তৃত আরও নানান ছবি ফুটেছে নস্ত্রাদামুর ক্যানভাসে। আছে 'ন্যাটো'র (NATO) ব্যর্থতার কথা ; জিম্বাবোয়ের সমস্যা ; পূর্ব ভূমধ্যসাগরে প্রেসিডেন্ট রেগনের যুদ্ধজাহাজ আর বোমারু বিমান মোতায়েন ; অলিম্পিক গেম্‌সে ইজরায়েলী অ্যাথলিটদের হত্যাকান্ড ; নিজের ক্লায়েন্টদের গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য প্রসিদ্ধ সুইস ব্যাঙ্ক পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়েছিল আদালতে বহু গোপন নথিপত্র দাখিল করতে— তার কথা ; রাশিয়ার নৌ-শক্তি ; য়ুরোপে প্রচন্ড মুদ্রাস্ফীতি ; রাজকুমারী অ্যান্ এর সঙ্গে সাধারণ মানুষ ক্যাপ্টেন মার্ক ফিলিপস্- এর বিবাহ ; মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর তেলসম্পদের কথা ; মুদ্রিত প্রচারের শক্তি ; এবং, হয়তো বা, মার্কসবাদের কথাও!

আর, প্রথম শতকের ৪৮ তম ভবিষ্যদ্বাণী :

চন্দ্রের আধিপত্যের কুড়ি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর, শুরু হবে সাত হাজার বছর ব্যাপী আরেকজনের শাসন। পরিশ্রান্ত সূর্য যখন আবর্তন শুরু করবে, তখনই সম্পূর্ণ হবে আমার ভবিষ্যদ্বাণী আর অমঙ্গলের ইঙ্গিত।

হিসেবমত, চাঁদের আবর্তনকাল (cycle) ছিলো ১৫৩৫ থেকে ১৮৮৯ পর্যন্ত। তাহলে সেই 'সাত হাজার বছরের শাসন' শুরু হয় ১৫৫৫ সাল থেকে—নস্ত্রাদামুর 'সেঞ্চুরিজ্'-এর প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়েছিল ঐ ১৫৫৫ সালেই! জ্যোতির্বিজ্ঞান বলছে, আমরা এখন রয়েছি কুম্ভের প্রভাবে।

নস্ত্রাদামু বুঝি ভেবেছিলেন ৭০০০ বছর জোড়া এক যুগের একেবারে সূচনায় প্রকাশ পেয়েছে তাঁর গ্রন্থের প্রথম অংশটি। মধ্যযুগের য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল ৭০০০ সালের সূচনায় নিভে যাবে ধরিত্রীর জীবন-পিদিম।

এ চতুষ্পদীর তাৎপর্য নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। নস্ত্রাদামুর অন্য অনেক ভবিষ্যদ্বাণী এই চতুষ্পদীর বক্তব্যের সঙ্গে খাপ খায় না।

মিশেল নস্ত্রাদামুর হারানো জীবনের খাঁজে ভাঁজে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে সাড়ে চারশো বছরের কনিষ্ঠা এরিকা শিথ্যাম্।

১০

বহু যুগের ওপার হতে

১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দের বসন্ত ঋতু। ছোট্ট শহর সালোঁয় আজ মাতন লেগেছে। মাতন লেগেছে অভিজাতদের প্রাণে প্রাণে। না, সাধারণ মানুষ এ মাতনের শরিক নয়।

দ্বিতীয় হেনরি মারা গেছেন চোখে মর্মান্তিক আঘাত পেয়ে। যে উৎসবে তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে উত্তেজনা খুঁজেছিলেন, সে উৎসব ছিলো তাঁর বোন আর মেয়ের বিবাহ-উৎসব। হেনরি-কন্যা মার্গেরিতের সঙ্গে হৃদয় বিনিময় করেছিলেন স্যাভয়ের ডিউক। সব কিছু মিটে যাবার পর ডিউক ফিরছিলেন নাইসের পথে। সালোঁর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় খবর পাওয়া গেলো—তাঁর এলাকায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে প্লেগ। আর পা বাড়ানোর সাহস পেলেন না ডিউক। অভিজাত ক্ষমতাবানদের চিরাচরিত দর্শনকেই আশ্রয়

করলেন তিনি : মরুক মানুষ নেইকো ক্ষতি, মোদের জীবনে থাকুক গতি। সালোঁতেই থেকে গেলেন ডিউক।

আজ আসছেন রাজদুহিতা মার্গেরিৎ। স্বামীর সঙ্গে যোগ দেবেন তিনি সালোঁতে। এখান থেকে যাবেন নাইসের পথে : যুগলযাত্রা।

অভিজাতগোষ্ঠী এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাল রাজকন্যাকে। এগিয়ে এলেন স্যাভয়ের ডিউক। রাজকন্যার মুখে তখন সোনা রোদের মতো হাসি চোখের ক্যানভাসে সাত সাগরের রত্ন ইশারা।

নানান উৎসবের ব্যবস্থা ছিল, ছিল হাজারো আয়োজন। ডিউক বললেন, 'ওনারা অনেক আয়োজন- টায়োজন করেছেন। একবার যাওয়া দরকার।'

স্বামীর চোখে চোখ রাখলো মার্গেরিৎ, 'না আগে অন্য এক জায়গায় যেতে হবে।'

'কোথায় ?' ডিউক বিস্মিত।

'যে অদ্ভুত মানুষ বাবার মৃত্যুর কথা নিখুঁতভাবে বলে দিয়েছিলেন তাঁর কাছে। এই সালোঁতেই থাকেন তিনি।'

সেই ভয়ঙ্কর নামটি উচ্চারণ করেন ডিউক, 'মিশেল দ্য নস্ত্রাদামু ?'

'হ্যাঁ মিশেল দ্য নস্ত্রাদামু।'

সালোঁয় মিশেলের বাড়িতে গিয়েছিলেন নবদম্পতি। নানান প্রশ্ন করেছিলেন রাজকুমারী, যথেষ্ট সম্মান দিয়েছিলেন ভবিষ্যদ্বক্তাদের রাজাকে। ফিরে যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন, 'আপনার সঙ্গে আমি কিন্তু যোগাযোগ রাখবো। আপনাকে আমার দরকার।'

হেসেছিলো মিশেল, 'রাখবেন, আমি খুশি হবো।'

পায়ে পায়ে পৃথিবীর আয়ু থেকে ক্ষয়ে গেলো দুটো বছর। ১৫৬১ সাল। মিশেল নস্ত্রাদামুর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো এক অশ্বারোহী যুবক।

সেজার, আঁদ্রে আর চার্লস—মিশেলের তিন পুত্র খুব উত্তেজক কোন খেলায় ব্যস্ত ছিল বাড়ির সামনে। অশ্বক্ষুরের শব্দে ফিরে তাকালো ওরা। যুবক প্রশ্ন করলো, 'এটাই কি মঁসিয় নস্ত্রাদামুর বাড়ি ?'

সিজার এগিয়ে এল, 'হ্যাঁ, উনি আমার বাবা।'

ঘোড়সওয়ার পা রাখলো মাটিতে, 'ওনাকে একবার খবর দাও। বলো—স্যাভয়ের ডিউক আর তাঁর পত্নী রাজকন্যা মার্গেরিৎ একটা জরুরী কথা জানতে চেয়েছেন।'

আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি কাড়াকাড়ি। তীরের মত ছুটে গেল আঁদ্রে আর চার্লস। কে আগে খবরটা দিয়ে অর্জন করতে পারে

এক দুর্লভ কৃতিত্ব। সেজার ছুটলো না। ছেলেমানুষী বুঝি আর মানায় না ওকে।

'বাবা বাবা, স্যাভয়ের রাজকন্যা আর তাঁর পত্নী ডিউকের মার্গেরিৎ খবর পাঠিয়েছে।' চার্লস হাজির।

'দূর ন্যালাক্ষ্যাপা। না বাবা, ডিউকের রাজকন্যা আর স্যাভয়ের মার্গেরিৎ লোক পাঠিয়েছে।' দরবারে প্রাজ্ঞ আঁদ্রেও সশরীরে উপস্থিত।

স্যাভয়, ডিউক, মার্গেরিৎ, রাজকন্যা—ছেলেদের উল্টোপাল্টা কথার এই শব্দগুলো থেকেই বুঝে নিয়েছে মিশেল যা বোঝার। দুয়ারের প্রতিনিধিকে আহ্বান জানায় ও, 'আসুন মঁসিয়।'

ঘরের ভিতরে বসে কথা বলে যুবক, 'ডিউক আর তার স্ত্রী তাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ জানতে চান।'

'বাচ্চা হয়েছে ওনাদের ?' অ্যান উৎফুল্ল।

'হয়নি, হবে। ডিউক পত্নী আসন্নপ্রসবা।'

গম্ভীর হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ অ্যান্, 'সে আবার কী ? যে সন্তান এখনও জন্মায়নি, তার ভাগ্য কী করে বলা যাবে ?'

যুবক হাসে। মিশেলের দিকে ইঙ্গিত করে সে বলে, 'ওনার ওপর ডিউকদের অগাধ আস্থা।'

মিশেল কথা বলে এবার, 'আজকের দিনটা আপনি এখানেই থেকে যান, মঁসিয়। কাল সকালে আমি আপনাকে আমার বক্তব্য জানিয়ে দেবো। রাতটুকু সময় চাই আমার।'

রাতটুকু সময় চাই !

গভীর রাতে সালোঁর ঐ বাড়ির ছাদের ঘরে এক মানুষ তার ট্রাইপড, দন্ড, জল, স্তিমিত কোন আলোর বিকীর্ণ আভা, কিসের যেন অজানা উপস্থিতি, চাপা স্বর, শব্দ, ছবির যাতায়াত।

ভোরবেলা যুবক তৈরী। নেমে এল মিশেল নস্ত্রাদামু। রাতজাগা ক্লান্ত শরীর। 'বাও' করলো যুবক। নস্ত্রাদামু জানালো ভবিষ্যৎ : ডিউক পত্নী মার্গেরিৎ প্রসব করবেন এক পুত্র সন্তান এবং সেই সন্তান তার আমলের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি হিসেবে পরিচিত হবে।

নস্ত্রাদামুর ভুল !

স্যাভয়ের ডিউকের ঐ সন্তান ভবিষ্যতে পরিচিত হয়েছিল চার্লস এমানুয়েল্ নামে। সেনাপতি সে হয়নি। মেলেনি নস্ত্রাদামুর ভবিষ্যদ্বাণী। কিন্তু মিশেলের পক্ষে কিছু যুক্তি ছিলই। প্রথমত, সে সঠিকভাবেই বলেছিল সন্তানটি হবে

পুত্র সন্তান; দ্বিতীয়ত, ভাগ্যচক্র তৈরী করার জন্য জাতকের প্রয়োজনীয় জন্মসময় হাতে পায়নি সে। চার্লস এমানুয়েলকে লোকে ডাকত মহান চার্লস বলে। আর ফরাসী নৃপতি চতুর্থ হেনরিকে সারাক্ষণ এক দুশ্চিন্তায় রেখেছিল মহান চার্লস। অন্তত আংশিক সফল ভবিষ্যদ্বাণী।

নানান ধর্মীয় গোষ্ঠীর কার্যকলাপে ফ্রান্স উত্তাল। শান্ত করার জন্য এগিয়ে এলেন রাজমাতা ক্যাথারিন। দ্বিতীয় পুত্র নবম চার্লস আর অন্য অনেককে সঙ্গী করে বেরিয়ে পড়লেন পথ পরিক্রমায় (কতকটা আজকের দিনের শান্তি পদযাত্রার মতো)।

ক্যাথারিন এসেছেন প্রভাঁসে। কয়েকদিন আগে এ অঞ্চলে খেলা করে গেছে নির্মম প্লেগ। বহুজন তাই এলাকা ছাড়া।

রাজমাতাকে উপযুক্ত সংবর্ধনা জানানোর কিছুটা অভাব চোখে পড়ে। ক্রুদ্ধ রাজা ফরমান দিলেন—প্রত্যেককে ফিরতে হবে, এবং ভালমতো দন্ড পেতে হবে প্রত্যেককে। প্লেগের খেলার পর দুয়ারে হাজির এক রাজকীয় খেলা!

১৫৬৪ সালের ১৭ অক্টোবর। বিকেল ঠিক তিনটের সময় সালোঁতে পা রাখলো রাজমাতাসহ রাজকীয় বাহিনী। পথে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বালির আস্তরণ। চারদিকে রোজমেরি গাছের শাখার রূপসজ্জা। একটি আফ্রিকান অশ্বের পিঠে সমাসীন রাজা। অশ্বের শরীরে ধূসররঙা বস্ত্রাবরণ, কালো ভেল্‌ভেটের সাজ, সোনার ঝালর। রাজার পরনে বেগনি-লাল পোশাক, পোশাকের ধারে ধারে রৌপ্যনির্মিত কারুকার্য, কানে শোভা পাচ্ছে বড় মাপের নীলকান্ত- মণির কর্ণাভরণ।

জনতা স্বাগত জানাচ্ছে রাজকীয় বাহিনীকে। ভয় থেকে জন্ম নিয়েছে এই ভক্তি। রাজা শাস্তি দেবেন। মানুষ শঙ্কিত।

রাজভক্ত মিশেল। কিন্তু সেদিনের অভ্যর্থনায় এক আশ্চর্য ঘটনা চোখে পড়লো। রাজভক্ত মিশেল নস্ত্রাদামু হাজির নেই পথে। রাজাকে স্বাগত জানাতে আসেনি ভবিষ্যদ্বক্তা। রাজার নিষ্ঠুর আদেশ ব্যথার কাঁপন জাগিয়েছে তার বুকে। প্লেগের অপ্রতিরোধ্য আক্রমণের সামনে অসহায় মানুষ জীবনের পথ খুঁজতে পালিয়েছিল এলাকা ছেড়ে। রাজা দেশে ফিরে এসেছে তারা, মাথায় ঝুলছে শাস্তির অমোঘ খড়্গ। এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এক নীরব প্রতিবাদ রেখে গেলো মিশেল: রাজঅভ্যর্থনায় সে অনুপস্থিত।

নিজের ঘরে অপেক্ষা করছে মিশেল। ক্যাথারিন তাকে ডেকে পাঠাবেনই।

ডাক এল। ডেকেছেন স্বয়ং রাজা।

সঙ্গে চললো সেজার। মিশেলের এক হাতে একখানা ভেলভেটের টুপি, অন্য হাতে রূপোর বাঁট লাগানো মালাক্কা ছড়ি। বাতের আক্রমণে ইদানীং বড় ভুগছে মিশেল। পল্লীভবনে রাজার সঙ্গে দেখা হলো মিশেলের।

রাজমাতা ক্যাথারিন এই মানুষটিকে চেনেন। ক্যাথারিন বললেন, 'এ কি জ্যোতির্বিদ, বাকিরা সব কোথায়?'

'বাকিরা?' মিশেল অবাক।

ক্যাথারিন হাসেন, 'হ্যাঁ। আপনার স্ত্রী, সন্তানরা—সব্বাইকে আনান। আমি ওদের সক্কলকে দেখতে চাই।'

অ্যান্ এলো। সঙ্গে আঁদ্রে, চার্লস আর তিন কন্যা মাদেলিন, অ্যানি, ডায়না। কনিষ্ঠা ডায়না তখন নিতান্তই শিশু। মায়ের কোলে বসে সে অবাক চোখ মেলে রাজাকে দেখছে।

ক্যাথারিন অনুরোধ জানালেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র তৃতীয় হেনরির ভাগ্য গণনা করার।

নস্ত্রাদামু জানালো—ফ্রান্সের রাজসিংহাসনে বসবে তৃতীয় হেনরি। খুশিতে উছলে উঠলেন রাজমাতা (সত্য হয়েছিল এই ভবিষ্যদ্বাণী)।

উঠে আসার সময় এক বালকের দিকে নজর পড়লো নস্ত্রাদামুর। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো থমকে গেলো ও। কে এই বালক? এ যে...

'এই ছেলেটি কে?' শুধলো ও।

উত্তর দিলেন ক্যাথারিন, 'ওর নাম হেনরি। নাভারেতে বাড়ি। অভিজাত বংশের ছেলে। আমাদের সঙ্গে ও ঘুরছে সর্বত্র।

মিশেলের মুখে গভীর চিন্তার ছাপ। ক্যাথারিনকে বললো ও, 'ছেলেটাকে আমি দেখতে চাই।'

'এই তো দেখছেন।'

'না, এভাবে নয়। সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় ওকে দেখতে চাই আমি।

চমকে মুখ তুললেন রাজমাতা, 'কেন?' কী এক রহস্যের ছায়া যেন দুলছে ঐ রহস্যময় ভবিষ্যদ্বক্তার অবয়বে!

মিশেল কিছু বলার আগেই ছুটে পালালো বালক হেনরি। এ আবার কী আপদ! লোকটা যে তাকে নগ্ন করে দেখতে চায়। ছি ছি, এত লোকের চোখের সামনে...... সে কি আর বাচ্চা আছে নাকি?

পরদিন সকালে শুধু পুরুষদের এক সমাবেশ ডাকা হলো। এবং সেই সমাবেশে সম্পূর্ণ নগ্ন করে হাঁটানো হলো ঐ বালককে। যা দেখার দেখে

নিলো মিশেল।

পোশাক পরে স্থানত্যাগ করলো ক্রুদ্ধ বালক।

এবং নস্ত্রাদামু ঘোষণা করলো : এই বালক, নাভারের হেনরি, একদিন রাজা হবে ফ্রান্সের।

গোটা ফ্রান্স সেদিন অবিশ্বাসের হাসি হেসেছিল। শুধু ক্যাথারিন যোগ দিতে পারেনি সে হাসিতে। এই ভয়ঙ্কর মানুষটিকে তিনি চিনতেন।

মিশেলের কথার সত্যতা প্রমাণ করেছিলো ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ। চার চারবার প্রবল গৃহযুদ্ধের পর ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেছিল এক মানুষ হেনরি দ্য নাভারে। চতুর্থ হেনরি। শেষ হয়েছিল ভ্যালয় পরিবারের একচ্ছত্র আধিপত্য। আর এই চতুর্থ হেনরিকেই সারাক্ষণ দুশ্চিন্তায় রেখেছিল মহান চার্লস এমানুয়েল—স্যাভয়ের ডিউক ও মার্গেরিতের সেই সন্তান।

সালোঁ থেকে ফিরে রাজা নবম চার্লস মিশেলের জন্য দুশো স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়েছিলেন। রানী দিয়েছিলেন আরও একশো স্বর্ণমুদ্রা। এবং মিশেলকে নিযুক্ত করা হয়েছিলো ফরাসী রাজসভার সাধারণ চিকিৎসক হিসেবে। মর্যাদা আরও বেড়েছিল নস্ত্রাদামুর।

এই সময়টাতে কিছু ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করেছে মিশেল। সে বলেছিল—নবম চালর্সের সঙ্গে বিয়ে হবে ইংল্যান্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথের। দূত গিয়েছিল এলিজাবেথের কাছে। সুকৌশলী এলিজাবেথ জানিয়েছিলেন—'আমার স্বামী হওয়ার পক্ষে নবম চার্লস বড়ই মহান এবং বড়ই ক্ষুদ্র।' হয় নি বিয়ে। অতঃপর মিশেল জানায়—নবম চার্লস নয়, এলিজাবেথের সঙ্গে বিবাহ হবে তৃতীয় হেনরির। ভবিষ্যতে তৃতীয় হেনরি ইংল্যান্ডের রাজ-অতিথি হয়ে এক বছর ছিলেন। এলিজাবেথ তাকে নানান কাজেও লাগান। ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে সামান্য সত্যতা থাকলেও, শেষ বিচারে তা ব্যর্থ। তৃতীয় হেনরিরও অঙ্কশায়িনী হননি ইংল্যান্ড দুহিতা প্রথম এলিজাবেথ।

মিশেলের বয়স তখন ষাট পেরিয়েছে। শরীরে জরার আক্রমণ, বার্ধক্যের ক্লান্তি, বাতের যন্ত্রণা—সবকিছু মিলে বোধহয় নষ্ট করে দিচ্ছিল তার শক্তিকে, তার একাগ্র মনঃসংযোগকে। তারই সঙ্গে ছিল রাজনৈতিক চাপ। হয়তো কখনও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনেক কথা বলানো হয়েছে তাকে দিয়ে।

এই সময়ই নস্ত্রাদামু জানিয়েছিল ক্যাথারিনকে—তাঁর পুত্র রাজা নবম চার্লসের আয়ুষ্কাল ৯০ বছর, আর ফ্রান্সের সর্বোচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী

মঁৎমর‍্যাঁসিও বেঁচে থাকবেন ৯০ বছর। পুত্রের দীর্ঘ জীবনের আশ্বাস পেয়ে মঁৎমর‍্যাঁসির কাছে খুশী ভরা চিঠি লিখেছিলেন রাজমাতা। কিন্তু, মঁৎমর‍্যাসি জীবনের নব্বইটা বসন্ত দেখে যেতে পারেননি। ১৫৬৭ সালে, ৭৪ বছর বয়সে, শেষ বসন্তের সাক্ষী হয়েছিলেন তিনি।

আর নবম চার্লস ?

১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দই তরুণ রাজার জীবনের বাসন্তী রঙে রাঙানো শেষ বছর। নবম চার্লসের বয়স তখন ঠিক ২৪ বছর।

ভুল ! নস্ত্রাদামুর ভুল ! এ ভুল বোধহয় দরকার ছিল। এই ভুলই স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছে : মিশেল দ্য নস্ত্রাদামু এক মানুষ, অলৌকিক কোন সত্তা নয়। অসাধারণ ক্ষমতা তার আয়ত্তে ছিলো, কিন্তু মানুষ বলেই, ভুলের কাঁটাঝোপে পা পড়েছে তারও।

রক্তাক্ত পায়ে শেষের পথ খুঁজেছে মিশেল।

১১

হাজার বছর শুধু খেলা করে

আজ থেকে হাজার বছর আগে য়ুরোপের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এক ভয়—সামনে ১০০০ সাল ! রহস্যময় একটা সংখ্যা। যীশুখৃষ্টের জন্মের পর ঠিক এক হাজার বছর অতিক্রান্ত। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে ঐ ১০০০ সালে। কাজকর্ম প্রায় বন্ধ করে শেষের দিনের অপেক্ষায় হিম হয়ে বসেছিল য়ুরোপ। আসলে, চার্চই বলেছিল—ধ্বংস হবে পৃথিবী।

পৃথিবী তার নিজের নিয়মে এগিয়েছে। অতিক্রান্ত হয়েছে ১০০০ সাল। তবু আশঙ্কা কাটতে সময় লেগেছে। প্রায় দুশো বছর লেগেছে পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে।

হাজার বছর শুধু খেলা করে। ১০০০ সালের ব্যর্থতার পর চার্চ বলতে শুরু করলো—২০০০ সালে ধ্বংস হবেই পৃথিবী। তারপর, জানা গেলো, হ্যালির সেই ধূমকেতু ফিরবে ১৯৮৬ সালে। চোখটা আটকে গেলো অনেকের : ১৯৮৬ ! অর্থাৎ, ২০০০ সালের প্রায় শরীর ছুঁয়ে ! হ্যাঁ, তাহলে ঐ ১৯৮৬ বা তার ঠিক পরে পরেই নিভে যাবে পৃথিবীর সব রঙ। ২০০০ সালের পর অন্ধকার গভীর, গভীরতম।

মিশেল দ্য নস্ত্রাদামুর মধ্যেও গভীর হয়েছে এ বিশ্বাস। হ্যালির ধূমকেতুর আগমনকে তিনি দেখেছেন পৃথিবীর সামগ্রিক সর্বনাশের ইঙ্গিত হিসেবে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ, মৃত্যুর সঙ্কেত হিসেবে। ষোড়শ শতাব্দীর মননের পক্ষে চিন্তাটা ছিল একান্তই স্বাভাবিক। চার্চের সমর্থন পুষ্ট করেছিল এ বিশ্বাসকে। তাই, নস্ত্রাদামুর চিন্তায় চার্চ, বিশেষত এই বিংশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নের চার্চ কেমন চেহারা নিয়েছে দেখা দরকার। এবং—পোপ।

ভ্যাটিকান: খ্রীশ্চিয়ান দুনিয়ার কেন্দ্রবিন্দু। এই ভ্যাটিকানের মর্যাদাহানি আর পোপতন্ত্রের অবসান, এ দুটোই ছিল নস্ত্রাদামুর পক্ষে এক ভয়ঙ্কর ভাবনা। যদিও নিজের পারিবারিক অতীত—ইহুদী মতবাদ—এক গভীর ছাপ রেখেছিল তাঁর জীবনে, তবু পোপতন্ত্রের অবসান তাঁর কাছে ছিল এক আঁধারময় পৃথিবীর দুঃস্বপ্ন, নৈরাজ্যের কালো ছায়া।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তৎকালীন পোপ দ্বাদশ পায়াস্ (Pius)। নস্ত্রাদামু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন—এই পোপ সাহায্য করবেন নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের, মিত্রশক্তি অধিকৃত য়ুরোপীয় ভূখন্ড থেকে পালাতে সহায়তা করবেন তাদের। সোজা কথায়, হিটলার আর পোপকে পরস্পরের মিত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন তিনি।

ষষ্ঠ শতকের ৪৯তম চতুষ্পদী:

যুদ্ধবাজ পার্টির পাশে মহান পোপ, যে পার্টি দানিয়ুবের সীমানা
অধিকার করবে। বাঁকানো ক্রশ তাড়া করবে বন্দীদের, সোনা,
রত্ন, একশত সহস্রেরও অধিক চুনি।

বাঁকানো ক্রশ অর্থাৎ নাৎসী পার্টির প্রতীক চিহ্ন 'স্বস্তিকা'র কথা আমরা আগেও পেয়েছি। নাৎসী পার্টির উদ্ভব অস্ট্রিয়ায়—জায়গাটা দানিয়ুব সংলগ্নই। আর আছে সোনা, চুনি, রত্ন। অজস্র বন্দীকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ঠেলে দিয়ে তাদের সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করেছিল নাৎসী যুদ্ধবাজরা। সেই সম্পত্তি, রাশিকৃত অলঙ্কারের ছায়া এই ভবিষ্যদ্বাণী। পোপের ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট না হলেও, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধবাজ পার্টির পাশে দাঁড়াবেন পোপ। যুদ্ধের পর ভ্যাটিকান শহরে নাৎসী যুদ্ধাপরাধীর আশ্রয় দেওয়ার জন্য তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল দ্বাদশ পায়াসকে।

প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়ে দ্বাদশ শতাব্দীর আইরিশ ভবিষ্যদ্বক্তা ম্যালাশির কথা। পোপতন্ত্র সম্পর্কে অতি বিস্তারিতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন

ম্যালাশি। ম্যালাশি ও নস্ত্রাদামু, দুজনেই বলেছিলেন যে দ্বাদশ পায়াসের পর আর ছজন পোপকে দেখবে পৃথিবী। দ্বাদশ পায়াস মারা গেছেন ১৯৫৮ সালে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত চারজন পোপকে দেখেছি আমরা। হাতে থাকে আর মাত্র দুজন। তারপর? কী ঘটতে চলেছে? ক্ষমতা হারাবে ভ্যাটিকান? নাকি অবসান ঘটবে পোপতন্ত্রের?

দ্বাদশ পায়াসের পর ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত, পোপের পদে থেকেছেন ত্রয়োবিংশ জন। ষষ্ঠ শতকের ২০-তম ভবিষ্যৎকথনে তার ছায়া:

মিথ্যা ঐক্য স্বল্পস্থায়ী হবে, কিছুটা হবে পরিবর্তিত, বৃহত্তর অংশটা হবে সংস্কৃত। জলযানে দুর্দশা ভোগ করবে মানুষ, এবং সেটা ঘটবে তখন যখন রোম পাবে এক নতুন চিতাবাঘ।

ত্রয়োবিংশ জন তাঁর বংশমর্যাদার নিদর্শন খচিত যে পোশাক পরতেন, তাতে আটকানো থাকতো একটা চিতাবাঘের ছবি।

এটার গুরুত্ব হয়তো তেমন কিছু নয়। কিন্তু তৃতীয় শতকের ৬৫-তম চতুষ্পদীর ভবিষ্যৎদর্শন?

সেই মহান রোমানের কবর যেদিন খুঁজে পাওয়া যাবে, তার পরের দিন নির্বাচিত হবে এক নতুন পোপ: সিনেট তাঁকে মেনে নেবে না, পবিত্র পানপাত্রে বিষাক্ত হবে তাঁর রক্ত।

'মহান রোমান' সেন্ট পিটারের কবর স্থান নিয়ে নানান বিতর্ক চলেছে। অবশেষে, ১৯৭৯ সালে খুঁজে পাওয়া গেছে এক সম্ভাব্য কবরস্থান (ভ্যাটিকান দাবি করেছে)। আর, ঠিক তার আগের বছর অপ্রত্যাশিতভাবে পোপের পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন, প্রথম জন্ পল। পোপ হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার মাসখানেক পরে কার্ডিনাল তাঁকে আমন্ত্রণ জানায় এক ভোজসভায়। ভোজসভায় যোগ দিয়েছিলেন নবনির্বাচিত পোপ। ঐ রাতই তাঁর জীবনের শেষ রাত। মারা গিয়েছিলেন জন্ পল। কেউ তাঁর দিকে নজর দেয়নি। কেলেঙ্কারি চাপা দেওয়ার চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগে ভ্যাটিকানের নেতৃবৃন্দ। কিন্তু সংবাদপত্র ছাড়েনি। অধ্যবসায়ী সাংবাদিকরা রাতের বুক খুঁড়ে উদ্ধার করেছিলেন অনেক তথ্য। যে নানদের ওপর দায়িত্ব ছিল পোপকে দেখাশোনা কবার, তারা কয়েক ঘন্টা কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মৃতদেহ কবরস্থ

করা হয়নি, অত্যন্ত দ্রুততায় পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। পোপের আদালত 'কিউরিয়া'র সদস্যরা সুনজরে দেখেননি জন্ পলকে (কিউরিয়ার সঙ্গে সিনেটকে মেলাতে অসুবিধে হয় না)।

এই আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণীর স্পর্শ পাওয়া যায় আরও দুটি চতুষ্পদীতে। চতুর্থ শতকের ১১নং আর দশম শতকের ১২-তম চতুষ্পদী:

মহান আলখাল্লার পরিচালন ভার যে পাবে, তাকে বেশ কয়েকবার কার্য সম্পাদনের [মুখোমুখি] হতে হবে। দ্বাদশটি লাল আসবে ঐ আচ্ছাদনকে ধ্বংস করতে: হত্যার নিম্নে সংঘটিত হবে হত্যা।

মহান আলখাল্লা বলতে পোপের পোশাক। পোপ প্রথম জন্ পল বেঁচে থাকলে হয়তো কিউরিয়াতে কিছু পরিবর্তন ঘটাতেন, যা মেনে নিতে রাজি ছিল না কার্ডিনালরা।

পোপ হিসাবে নির্বাচিত হবার পর তাঁর সঙ্গে ছলনা করবে নির্বাচিতরা [কিউরিয়া], আকস্মিকভাবে ও অপ্রত্যাশিতভাবে সরে যেতে হবে, খুবই দ্রুত ও ভীরুভাবে। অতিরিক্ত সাধুতা ও দয়ালুতার ফলে নিহত হওয়ার সময় সে শঙ্কিত হবে সেই রক্ষীটির কথা ভেবে, যে নিহত হবে তার মৃত্যুর রাত্রেই।

জানা যায় না সেই কালরাত্রের গভীরে কোন রক্ষী শেষবারের মতো শ্বাস নিয়েছিল কি না। গোটা ব্যাপারটাকেই চাপা দেওয়ার মরিয়া প্রচেষ্টা করেছিল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু পোপের নিহত হওয়া? ভুল নেই তাতে।

বর্তমান পোপ দ্বিতীয় জন পল সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবক্তাদের রাজা জানিয়েছেন—এই পোপের জীবননাশের জন্য দু'দুবার আক্রমণ হবে। প্রথম আক্রমণ ঘটে গেছে। ১৯৮১ সালের ১৩ মে রোমের ভ্যাটিকান স্কোয়ারে এক তুর্কী মেহমত আলি আগ্‌সা আঘাত করে পোপকে। গুরুতর আহত হন পোপ। তুরস্ক নস্ত্রাদামুর প্রাচ্যদেশ! এক বুলগেরিয়ান সের্গেই ইভানভ আন্তোনভ্‌ও চক্রান্তে জড়িত ছিল বলে জানা যায়। জড়িত ছিল আরো অনেকেই। নস্ত্রাদামুর কথামতো আরেকটা আক্রমণ ঘটবে, সম্ভবত মিলান শহরে।

১৯৮৩-র ৬ মে একটা খবর আসে। খবরটা সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়নি। এক পর্তুগীজ যাজক স্বীকার করে যে সে বেয়নেটের ভাঙা টুকরো দিয়ে পোপ দ্বিতীয় জন পলকে হত্যার চেষ্টা করেছিল। এটা সত্য হলে, বর্তমান পোপের জীবনের ওপর দু'দুবার আক্রমণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গেছে ইতিমধ্যেই। কোনও এক পোপকে ভ্যাটিকান ত্যাগ করে যেতে হবে বলেও জানিয়েছে নস্ত্রাদামু। আর বলেছেন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভ্যাটিকানে থাকবেন পল্ নামে এক পোপ। বর্তমান পল্?

দ্বিতীয় শতকের ৪নং চতুষ্পদীতে পোপের ভ্যাটিকান ত্যাগ :

বিরাট তারাটি সাতদিন ধরে জ্বলবে এবং মেঘ দুটি সূর্যকে প্রকাশিত করবে। প্রকান্ড ম্যাস্টিফ্ গর্জন করবে সারারাত, যখন মহান পোপ পাল্টাবেন তাঁর বাসস্থান।

মিশেল নস্ত্রাদামু মারা যাওয়ার পরবর্তী সুদীর্ঘ ইতিহাসে কয়েকজন পোপ তাদের বাসস্থান ত্যাগ করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুজন। পোপ ষষ্ঠ পায়াস্‌কে নেপোলিয়ন বন্দী করেছিলেন। ভ্যালেঁস্-এ মারা যান তিনি। পোপ সপ্তম পায়াসও কিছুদিন বন্দী ছিলেন ফ্রান্সে। প্রশ্ন ওঠে ঐ দুটো সূর্যকে কেন্দ্র করে। সূর্য আবার দুটো হয় কি করে!

মনে রাখা দরকার, নস্ত্রাদামু বিজ্ঞান বুঝতেন। ধূমকেতুর পুচ্ছ দেখতে কেমন, সে ধারণা তাঁর ছিল। ধূমকেতুর আগমনের সময় প্রতিসরণের ফলে মানুষ দুটো সূর্য দেখবে, এমনটা ভেবে থাকতে পারেন তিনি। এমন দৃষ্টিগত বিভ্রম প্রকৃতিতে প্রায়শঃই ঘটে। এই ধূমকেতুকে হ্যালির ধূমকেতু হিসেবে মেনে নিলে বর্তমান পোপই নস্ত্রাদামুর সেই বাসস্থানচ্যুত পোপ। হ্যালির ধূমকেতু ফিরে এসেছিল ১৯৮৬ সালে। এবার ঐ সাতদিনকে সাত বছর ধরলে আমরা পৌঁছাই ১৯৯৩ সালে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইঙ্গিত?

পল নামে এক পোপের কথা অষ্টম শতকের ৪৬-তম চতুষ্পদীতে :

চিরকুমার পল মারা যাবে রোম থেকে তিন লীগ দূরে, নিকটতম দুজন তাড়িয়ে দেবে নির্যাতিত দানবকে, যখন মার্স [যুদ্ধ] গ্রহণ করবে তার ভয়ঙ্কর সিংহাসন, মোরগ আর ঈগল, ফ্রান্স, তিন ভ্রাতা।

ষোড়শ শতাব্দীর মানুষ নস্ত্রাদামুর এই ভবিষ্যদ্বাণীর পর থেকে আজ পর্যন্ত পল নামক মোট চারজন পোপকে দেখেছি আমরা। ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চম পল, ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত ষষ্ঠ পল, ১৯৭৮-এ প্রথম জন্ পল আর ১৯৭৮ থেকে বর্তমান পোপ দ্বিতীয় জন্ পল। ছোট্ট সূত্র হিসেবে এসেছে তিন ভ্রাতার উল্লেখ: তিন কেনেডি ভ্রাতাকে চিনে নেওয়া যায়। তৃতীয় কেনেডি এডওয়ার্ড আজও জীবিত। অর্থাৎ, এই চতুষ্পদীর সম্ভাব্য ঘটনা এখনও ঘটেনি, ঘটতে চলেছে। ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই সময়ের কোন এক পোপ মারা যাবেন রোমের অনতিদূরে, অথবা ফ্রান্সে ('প্রফেসিজ'-এর মূল সংস্করণে রোম-এর জায়গায় ছিল 'রনস', Ronse ছাপার ভুল হলে এটা 'রোম', না হলে ফ্রান্স বলেই ধরা যায়)। আসবে তখন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, দুটি মিত্রশক্তি সংগ্রাম করবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে। মোরগ হচ্ছে ফ্রান্সের স্বাভাবিক প্রতীক, আর ঈগল আমেরিকার। তিন ভ্রাতা সম্বন্ধে এখানে স্পষ্টভাবে আমেরিকারই উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে।

আমাদের এই সময়, আগামী যুদ্ধ আবার এসেছে দ্বিতীয় শতকের ৪৬-তম চতুষ্পদীতে—

> **মানবজাতির প্রবল দুর্দশার পর এগিয়ে আসবে আরও বড় এক দুর্দশা যখন শতাব্দীর মহান আবর্তন নিজের পুনর্নবীকরণ করতে শুরু করবে। রক্ত, দুগ্ধ, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ ও ব্যাধির বৃষ্টি হবে। আকাশে দেখা যাবে আগুন, সে টেনে নিয়ে যাবে স্ফুলিঙ্গের এক বিরাট পুচ্ছ।**

কোন এক শতাব্দীর শেষভাগে যুদ্ধ আর পুচ্ছবিশিষ্ট আগুন অর্থাৎ ধূমকেতুর আগমন। এড়ানোর পথ নেই, এক অদৃশ্য আঙুল বারবার ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে আমাদের এই ঝোড়ো সময়কে। বিশ্বের দুয়ারে আজ ধ্বংসের দামামা।

নতুন পোপ প্রসঙ্গে পঞ্চম শতকের ৪৯-তম কথন:

> **স্পেন থেকে নয়, প্রাচীন ফ্রান্স থেকে সে নির্বাচিত হবে কম্পমান জাহাজের জন্য। যে শত্রু তার আমলে সৃষ্টি করবে বিরাট মহামারী তার কাছে সে এক প্রতিশ্রুতি দেবে।**

নস্ত্রাদামুর পরবর্তীকালে ফ্রান্স থেকে কোন পোপ নির্বাচিত হননি। ছবিটা তাই ভবিষ্যতের। বোঝা যায়, পোপ পদের জন্য থাকবে দুজন প্রার্থী—একজন স্পেনের, অপরজন ফ্রান্সের। 'কম্পমান জাহাজ' অর্থাৎ চার্চ তখন এক টলোমলো অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে। কোন্ শত্রুর কথা বলা হয়েছে স্পষ্ট নয়।

চার্চ পোপ ইত্যাদির আরও নানান চিত্র ছড়িয়ে আছে নস্ত্রাদামুর লেখায়। যেমন, ভ্যাটিকান দাবি করেছে যে সেন্ট পিটারের কবরস্থান খুঁজে পাওয়া গেছে। নস্ত্রাদামুর হিসেবে সেই কবরস্থানের সন্ধান মেলেনি এখনও। কোন এক এপ্রিল মাসে ঘটবে এক মারাত্মক ভূমিকম্প, আর তখন মিলবে সেই হারানিধির সন্ধান।

পোপের বর্তমান 'কিউরিয়া'র সদস্য ইংরেজ কার্ডিনাল ওয়েস্ট-মিন্স্টারের ব্যাসিল হিউম্ হয়তো আগামী দিনে পোপ হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন।

আছে ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত সময়কালের পোপ ত্রয়োবিংশ জন-এর জনপ্রিয়তার কথা।

নস্ত্রাদামু এবং ম্যালাশি, দুজনেই ইঙ্গিত দিয়েছেন পোপতন্ত্রের আসন্ন ধ্বংসের। আর মাত্র দুজন পোপ আসবেন ক্ষমতায়—কত বিস্ময় অপেক্ষা করছে এই বিংশ শতাব্দীর অন্তিম প্রহরে। পৃথিবীতে ঢের দিন বেঁচে থেকে আমাদের আয়ু। এখন মৃত্যুর শব্দ শোনে দিনমান।

শব্দ শুনছে এরিকা শিথ্যাম্।

১২

পূর্ব দিগন্তে কৃষ্ণসূর্য জাগে

মিশেল দ্য নস্ত্রাদামুর ভবিষ্যৎ চিন্তায় ধ্বংস খেলার কেন্দ্রভূমি প্রাচ্যদেশ। বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন নস্ত্রাদামু। আর বার বার বলেছেন—পারস্যের বা ইরানের শাহ ক্ষমতাচ্যুত হবে। পারিতে বসে তার বিরুদ্ধে চক্রান্তের নীল নক্সা তৈরী করবে একজন। এই মানুষটিকে নস্ত্রাদামু চিহ্নিত করেছেন সাদা রঙের মানুষ, সাদা পাগড়ির মানুষ হিসেবে। ফ্রান্সে বসবাস করবে সে। পারস্যে ফিরে সে এক নির্মম শাসন চালু করবে।

কিন্তু রেহাই নেই সাদা মানুষেরও। আসবে আর একজন, নস্ত্রাদামুর বর্ণনায়
নাম তার 'পার্স' (Perse) । সে হবে নীল রঙের মানুষ, পারস্যের অধিবাসী।
এই পার্স ক্ষমতাচ্যুত করবে ঐ সাদা পাগড়ির শাসককে। আর এই পার্সের
সঙ্গে নস্ত্রাদামু যুক্ত করেছেন আরও দুটি নাম—অ্যালিয়ুস, ম্যাবিয়ুস। তিন
নম্বর খ্রীষ্টবিরোধী হিসেবে এই দুটি নামের উল্লেখ আমরা আগেই পেয়েছি।
আমাদের জমা খরচের খাতায় যুক্ত হলো নতুন একটা নাম : পার্স! এরাই
পৃথিবীর আসন্ন বিপদের দ্যোতক, অথবা এরাই গড়ে তুলবে সেই রক্তলোলুপ
নেতাকে। আসবে বিশ্বযুদ্ধ নম্বর তিন।

আজকের পৃথিবীর বিস্ফোরক পরিস্থিতির খোঁজ পাওয়ার জন্য এমন কিছু
তল্লাসীর দরকার হয় না। যে কোন একদিনের কোন দৈনিক সংবাদপত্রের
শুধু কয়েকটা হেডিংএ চোখ বুলোলেই সর্বনাশের ছায়া দেখা যায়। এর
মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য এক জ্বলন্ত অঞ্চল। বারবার বলছেন ভবিষ্যদ্বক্তা—'অষ্টম
দশক' অর্থাৎ ১৯৮০-র দশকের মধ্যপ্রাচ্য পৃথিবীর পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
এখান থেকেই শুরু হতে পারে তৃতীয় মহাযুদ্ধ, ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।
আধুনিক রাজনীতির সুলুক-সন্ধান জানার দরকার নেই, যে-কোন সাদামাটা
খবরের কাগজ-পড়নেওয়ালাই জানে : মধ্যপ্রাচ্য জ্বলছে। প্যালেস্তাইন মুক্তি
সংস্থা (P L O) , আরাফাত, আয়াতোল্লা খোমেইনি, গদ্দাফি, রাষ্ট্রপতি
সাদাতের হত্যা, লেবাননের ঘটনা, ইরান-ইরাক যুদ্ধ, ইরাকের কুয়েত দখল,
ইরাকের বিরুদ্ধে আমেরিকাসহ ২৪টি দেশের যুদ্ধ, ওদিকে বিদ্রোহীদের দখলে
ইথিওপিয়া, উত্তাল শাদ। আরও অজস্র ঘটনার জটিল স্রোত। নানান
রণসম্ভার নিয়ে হাজির আমেরিকা।

এই অধ্যায়ের প্রথমেই বলা হয়েছে—ইরানের শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করবে
এক সাদা রঙের মানুষ, সাদা পাগড়ির মানুষ। সন্দেহের অবকাশ বিশেষ
নেই যে এই মানুষটিই দোর্দণ্ডপ্রতাপ আয়াতোল্লা খোমেইনি। আয়াতোল্লা
আর তার সাকরেদরা মাথায় পরতো শ্বেত শিরস্ত্রাণ, শহীদদের স্মরণে তারা
তুলে নিয়েছিল শ্বেত পোশাক, অর্থাৎ 'পবিত্র যুদ্ধের' জন্য তারা ঝরিয়ে
দেবে শেষ শোণিতকণাটুকুও। তারপর, এই সাদা নেতাকে সরিয়ে আসবে
সেই নীল নেতা : পার্স। দ্বিতীয় শতকের ২নং চতুষ্পদী বলছে—

নীল মাথাওয়ালা [নেতা] সাদা মাথাওয়ালার ততটা ক্ষতি করবে,
যতটা উপকার করেছিলো ফ্রান্স। বৃক্ষশাখা থেকে ঝুলছে বৃহৎ
শুঁড়জনিত মৃত্যু, যখন রাজা জানতে চাইবেন যে তাঁর কতজন

লোক বন্দী হয়েছে।

শ্বেত উষ্ণীষধারীর সামনে বিপদের পতাকা হাতে এগিয়ে আসছে নীল উষ্ণীষের পার্স। সেই নীল উষ্ণীষের মানুষ ইরানকে আরও খারাপ অবস্থায় টেনে নিয়ে যাবে। ইরান-ইরাক সম্পর্ক ও সংঘর্ষের কথা মনে রাখলে চিন্তাটা ভেসে ওঠে—নীল উষ্ণীষধারীর আগমন কি ইরাক থেকেই ঘটবে ?

আয়াতোল্লা খোমেইনি বিশ্বের রাজনীতিক মানচিত্রে একটি কুখ্যাত নাম। ইরানের শরীরকে সে ছিঁড়ে ফালাফালা করেছে অত্যাচারের বিষছুরি দিয়ে। যুদ্ধ আর রক্তের দিকে এই স্বৈরাচারীর ছিল দুর্বার আকর্ষণ। আজও অস্থির ইরান।

প্রথম শতকের ৭০-তম চতুষ্পদী :

বৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধ বন্ধ হবে না পারস্যে। বিপুল এক অবস্থার বিশ্বাসঘাতকতা করবে এর শাসকের সঙ্গে। ফ্রান্সে শুরু হওয়া এইসব কার্যকলাপ তারপর শেষ হবে সেখানে, এক সংযত জনের গোপন লক্ষণ।

থামবে না পার্স। তার রক্তমাতাল থাবা এগিয়ে যাবে দিকে দিকে। রক্তে রক্তে লাল হয়ে উঠবে মধ্যপ্রাচ্য, ঈজিপ্ট, গ্রীস। পঞ্চম শতকের ২৭তম চতুষ্পদী :

কৃষ্ণসাগরের কাছাকাছি থেকেই সে আসবে আগুন আর অস্ত্র নিয়ে, পার্সের কাছ থেকে, ট্রেবিসোণ্ড দখল করার জন্য। প্রকম্পিত হবে ফ্যারোস্ আর মাইটিলিন, সূর্য উজ্জ্বল, অ্যাড্রিয়াটিক্ সাগর ভরে যাবে আরবীয় রক্তে।

বিশ্লেষণের বোধহয় প্রয়োজন নেই। পার্সের মরণক্রীড়ায় আরবীয় রক্তের আলপনা আঁকা হবে। সাম্প্রতিক ইরাকি হানার কথাটা মনে পড়তে পারে অনেকের। ফ্যারোস আর মাইটিলিজের উল্লেখ থেকে মনে হয় মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে ছড়িয়ে পড়বে গ্রীসও।

নবম শতকের ৭৩-তম কথন :

নীল উষ্ণষধারী এক রাজা প্রবেশ করবে ফয়েক্স-এ, শনির আবর্তনের থেকে কম সময় রাজত্ব করবে সে। সাদা উষ্ণষধারী রাজা, বাইজান্টিয়ামে নির্বাসিত তার হৃদয় : সূর্য, মঙ্গল ও বুধ কুম্ভের কাছাকাছি।

ধরে নেওয়া যায় ঐ সাদা উষ্ণীষ খোমেইনির, আর নীল উষ্ণীষ পার্সের। আমরা এখানে পার্সের শাসনকালের পরিধিটা জানতে পারছি। শনির আবর্তনের থেকে কম সময় স্থায়ী হবে পার্সের আধিপত্য। অর্থাৎ, সাড়ে উনত্রিশ বছরের থেকে কম সময়। কিন্তু ঠিক ক বছর? জানা যাচ্ছে না।

ইরানের শাহ্-এর পরিণতি আমরা ভুলিনি। পঞ্চম শতকের ৮৬-নং ভবিষ্যদ্বাণীতে যেন শাহ্-এর ছবি—

তাদের মধ্যে কয়েকজন বিরাট মানুষ নির্বাসনে, ঘুরে বেড়াবে। পারস্যের নেতা অত্যন্ত বিপন্ন করবে বাইজান্টিয়ামকে [তুরস্ক]।

১৯৭৮ সালে শাহ্-এর ইরান থেকে নির্বাসন, তারপর মৃত্যুর কথা হয়তো মনে পড়বে পাঠকের। পাঠক মনে রাখুন, কথাগুলো বলে গেছেন আজ থেকে প্রায় চারশো কুড়ি বছর আগেকার এক মানুষ।

চারশো কুড়ি বছর আগে সেই ফরাসীর ভাবনায় ছিলো—আয়াতোল্লা খোমেইনির শাসন শেষ হয়ে যাবে আকস্মিকভাবে। এই ঘটনার পিছনে কাজ করবে অনেকগুলো কারণ : রাশিয়ার হস্তক্ষেপ, তেল সংকট এবং ঝড়ের চরম পর্বে অচেনা সেই পার্সের আবির্ভাব। ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনের সঙ্গে কি কোন সম্পর্ক আছে এই পার্সের?

ইসলামিয় আইনের পতন সম্ভবত আরেকটি চতুষ্পদীতেও ছাপ ফেলেছে (তৃতীয় শতক, ৯৭-তম চতুষ্পদী)। এখানে, বিংশ শতাব্দী অর্থাৎ 'সূর্যের শতাব্দী'র শেষে ইজরায়েলের পরিস্থিতির ছবি ফুটেছে ক্যান্‌ভাসে—

সিরিয়া, জুডা ও প্যালেস্তাইনের আশপাশে এক নবসৃষ্ট দেশে কায়েম হবে নতুন আইন। সূর্যের শতাব্দী সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই পতন ঘটবে বিরাট বর্বর সাম্রাজ্যের।

এ যুগটা শুধু কুম্ভের নয়, এটা সূর্যের শতাব্দীও বটে। আর এই শতাব্দীতে

সিরিয়া, জুডা ও প্যালেস্তাইনের আশপাশে সৃষ্টি হয়েছে একটাই মাত্র দেশ : ইজরায়েল। ইজরায়েল-আরব সংঘাতের কথা মনে রাখলে ধরা যায়—শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে ইজরায়েল। ইহুদী রাষ্ট্র ইজরায়েলের জয় এবং তার আইনের উত্থান ইসলামিয় আইনের পতনের সঙ্কেতবাহী। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়তে পারে মিশেল দ্য নস্ত্রাদামুর পারিবারিক অতীতে ইহুদী ভাবনা মিশে আছে অঙ্গাঙ্গীভাবে।

নস্ত্রাদামুর ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে অনেকের মতে ঐ তৃতীয় খ্রীষ্টবিরোধী পার্সের বয়স এখন (১৯৯১ সালে) ৩৮-৩৯ হওয়া উচিত। তাঁদের হিসেবে ১৯৫২-৫৩ সাল নাগাদ ঐ আতঙ্কের জন্ম হওয়া উচিত পৃথিবীতে। এবং এখন সে প্রস্তুত হচ্ছে ক্ষমতা দখলের জন্য, হিটলারের পর আরেকবার পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তোলার জন্য। একটা বিশেষ চতুষ্পদী থেকে অনেকে হিসেব করেছিলেন—১৯৮৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর তার আবির্ভাব ঘটবে। ঘটেনি। এখনও পর্যন্ত সে (অথবা অ্যালিয়ুস/ম্যাবিয়ুস) রয়েছে পুরোপরি রহস্যের অতলে। এটুকু হিসেব করা যায় : তার বয়স ত্রিশের ওপরে হবেই (অপরিণত বুদ্ধির কেউ ঐ প্রলয় ঘটাতে পারে না), অন্য কোন দেশের অঙ্গুলী হেলনে চলার মতো রাজনৈতিক পুতুল সে হবে না (কারণটা সহজবোধ্য ; রাজনীতিক পুতুলের পক্ষে বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টি করা অসম্ভব), এবং তার থাকবে আকাশ-ছোঁয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা। চার্লি চ্যাপ্‌লিনের 'গ্রেট ডিক্‌টেটর'-এর মতো পৃথিবীটাকে নিয়ে লোফালুফি করতে চাইবে সে। (ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনের নামটা কি ভেসে উঠছে পাঠকের চেতনায় ?)।

পার্সের আবির্ভাব ও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নির্ণয়ে নস্ত্রাদামুর বক্তব্যে কিছু কিছু বিভ্রান্তির অবকাশ রয়ে গেছে। বিংশ শতাব্দীর রাজনীতি বড় অস্থির। এমনকি আজকের দিনের রাজনীতি বিশেষজ্ঞরাও প্রায়শঃই খেই রাখতে পারেন না, তাল মেলাতে পারেন না এলোমেলো ঘটনাস্রোতের সঙ্গে। কাজেই, চারশো বছর আগেকার পুরনো সেই পৃথিবীর এক মানুষ যে মাঝে-মাঝে বিভ্রান্ত হবে, তা আর আশ্চর্য কী! এশিয়ার মাটি থেকে উদ্ভুত ঐ খ্রীষ্টবিরোধীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য হাত মেলাবে সোভিয়েত রাশিয়া আর পাশ্চাত্য দুনিয়া, এমন একটা সম্ভাবনার কথা বলেছেন তিনি। আজকের বিশ্ব-পরিস্থিতির বিচার বিশ্লেষণে এ ঘটনা সাড়ে নিরানব্বই শতাংশ অসম্ভব। দুটি বৃহত্তম শক্তি, পারমাণবিক অস্ত্র আর বোমা-বাহক মিসাইল থরে থরে সাজিয়ে চরম মোকাবিলার লগ্নের জন্য প্রস্তুত, দুনিয়া জুড়ে দুই

শক্তির টানাপোড়েন, শীর্ষ বৈঠকের ব্যর্থতা, গ্রহযুদ্ধের তোড়জোড়—না, ঐক্য প্রায় অসম্ভব। আধ শতাংশ হলেও, একটা ক্ষীণ আশা হয়তো লুকিয়ে আছে কোথাও মাটির অনেক গভীরে, যেখানে লাতিন-আরবী-বাংলার জেহাদের চিরকুটে একই ভাষা, যেখানে আলোর শিশুরা কোন সোনামাখা সঙ্গীতের সুরে-তালে মেলা-খেলা বসায়, রামধনুর রঙে রঙে ফোটায় চিত্রমালা, খুঁজতে বেরোয় এক হারানো নীলকণ্ঠ পাখি। তৃতীয় খ্রীষ্টবিরোধীর দুনিয়া ধ্বংসের স্বপ্ন ভাঙতে পারে একমাত্র এই ঐক্যই (এরিকা শিথ্যামের পথ ছেড়ে একটু অন্য পথে একটা প্রশ্ন তোলা যায়। আজকের পৃথিবী অতীতের যাবতীয় মারণাস্ত্রের ধ্বংসক্ষমতাকে অবহেলায় নস্যাৎ করে আবিষ্কার করেছে তার নিজের মরণবান : পরমাণু বোমা। তারপরও এসেছে হাইড্রোজেন বোমা, নিউট্রন বোমা, বিচিত্র সব ক্ষেপণাস্ত্র। আর এই অস্ত্রস্তূপের বৃহত্তম অংশটাই জমা হয়ে আছে দুটি দেশের ভাণ্ডারে—আমেরিকা আর সোভিয়েত ইউনিয়ন। এছাড়া ব্রিটেন, ফ্রান্সও পরমাণু অস্ত্রে মোটামুটি সুসজ্জিত। এশিয়ার, বা নির্দিষ্টভাবে মধ্যপ্রাচ্যের, কোন শক্তির পক্ষে কি আদৌ সম্ভব ঐ দানবাকার শক্তির মোকাবিলা করে পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া? না, এবং স্পষ্টতই, না। সম্ভাবনা একটাই—ঐ এশিয় খ্রীষ্টবিরোধীর চক্রান্তের পিছনে রাশিয়া বা আমেরিকা থাকবেই। রণসম্ভার আসবে কোন বৃহৎ শক্তির কাছ থেকেই। হয়তো সেই ধ্বংসকর্তা নিছক পুতুল হবে না, কিন্তু সাহায্যের জন্য হাত তাকে বাড়াতেই হবে। আর, ক্ষীণ হলেও, দ্বিতীয় একটা সম্ভাবনা চোখে পড়তে পারে। এই এশিয়ায় মাত্র একটিই শক্তি আছে, যে, অন্তত কিছুটা হলেও, মোকাবিলা করতে পারে দুই বৃহৎ শক্তির : চীন! এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে, চীনেরও পরমাণু অস্ত্র আছে; চীন মোটামুটি এক তৃতীয় শক্তি হিসেবে চিহ্নিত; এবং মতাদর্শের প্রশ্নে চীনের কিছুটা ভিন্ন এক অবস্থান আছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত চীনকে আমরা বিশ্বের ধ্বংসকারী কোন শক্তি হিসেবে দেখতে পাচ্ছি না। পার্স কি তার কার্যকলাপের পিছনে চীনের সমর্থন পাবে? প্রশ্নটা বিশ্ব-রাজনীতির। এককথায় কোন লাগসই উত্তর দিতে যাওয়া মূর্খতার নামান্তর মাত্র। আমরা বরং ভবিষ্যতের দিকেই তাকিয়ে থাকি। শতাব্দীর জাবদাখাতায় তো আর মাত্র সাড়ে আটটা বছর জমা আছে!)

দুবার উদ্দীপ্ত হয়ে এবং দুবার হতাশ হয়ে প্রাচ্য দুর্বল করবে পাশ্চাত্যকেও। তার প্রতিপক্ষ, বেশ কয়েকটি যুদ্ধের পর, সমুদ্রে

ভাড়া খেয়ে, প্রয়োজনের সময় ঐক্যবদ্ধ হবে।

পাশ্চাত্য আর তার এক প্রতিপক্ষ ঐক্যবদ্ধ হবে প্রয়োজনের সময়, এবং এই ঐক্য প্রাচ্যের সেই শক্তির বিরুদ্ধে। পাশ্চাত্যের শক্তি হিসেবে আমেরিকাকেই ধরে নেওয়া যায়। আর তার প্রধান প্রতিপক্ষ? হাস্যকর প্রশ্ন। রাশিয়া-আমেরিকা মৈত্রীর আভাস অষ্টম শতকের এই ৫৯-তম চতুষ্পদীতে।

এই একটুখানি আশাকণা ছুঁড়ে দিলেও, অন্যত্র (চতুর্থ শতক, ৯৫-তম চতুষ্পদী) অনেক বেশি বাস্তব কথা শুনিয়েছেন নস্ত্রাদামু। পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন—টিকবে না এ ঐক্য, এ এক নেহাৎ পল্‌কা সুতোর বাঁধন। ১৯৯০-র দশকের আমরাও জানি, দুই 'বিশ্বপ্রভু'র মধ্যে পাকা গাঁটছড়া আর বাঁধা যাবে না। চেষ্টা-চরিত্তির করলে দু-তিন পাক হয়ত ঘোরানো যায়, কিন্তু সাত পাক? নৈব নৈব চ।

দুজনের ঐ শাসনকে তারা টিকিয়ে রাখবে অতি স্বল্পকাল। তিন বৎসর আর সাত মাস অতিক্রান্ত হলে তাদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হবে। দুই অনুচর [দেশ] বিদ্রোহ করবে তাদের বিরুদ্ধে। তারপর বিজয়ীর জন্ম হবে আমেরিকার মাটিতে।

দুই শক্তি অল্পকালের দোস্তি ছুঁড়ে ফেলে আঘাত হানবে পরস্পরের ওপর। তিন বছর সাত মাস জুড়ে আমাদের দেখতে হবে ধুরন্ধরের কূটনীতির খেলা। এদের কোন্ দুই তাঁবেদার রাষ্ট্র বিদ্রোহের রক্তপতাকা তুলে নেবে, বলা যাচ্ছে না। কোন সূত্র নেই। তবে, জয়ের সূর্য শেষে ঢলে পড়বে পাশ্চাত্যের মাটিতে, আমেরিকার শরীরে। জানি না, কী রঙ হবে সেই সূর্যের!

(এরিকা শিথ্যাম্ আর একটা পথ খুঁজতে চেয়েছে। আমেরিকা কি ঐ দুই ক্ষণস্থায়ী মিত্রের একজন, নাকি সে আসলে তৃতীয় শক্তি? প্রশ্নটা ভাবার মতোই। এমনটা কি হতে পারে যে ঐ পার্স (বা অ্যালিয়ুস্/ম্যাবিয়ুস্) রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে শুরু করবে তার স্বপ্নযাত্রা? হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে পার্সের পক্ষে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটানো অসম্ভব কিছু নয়। প্রতিপক্ষ আমেরিকা। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী ভেঙে যাবে পার্সের। আর তখন, যুদ্ধ জয় তো আমেরিকার কাছে কড়ে-আঙুলের খেলা। কিন্তু মৈত্রী ভঙ্গ হলেও, রাশিয়া কি নিরপেক্ষ দর্শক হয়ে থাকবে? বোধহয়,

না। সমস্যাটা এইখানে এসে আবার বড় জটিল হয়ে ওঠে।)

দুই শক্তির মৈত্রী এবং মৈত্রীভঙ্গের কথা পঞ্চম শতকের ৭৮ নং চতুষ্পদীতেও :

> **ঐ দুজন দীর্ঘদিন মিত্র থাকবে না : তেরো বছরের মধ্যেই তারা হার মানবে বর্বর শক্তির কাছে। উভয় পক্ষেরই প্রচুর ক্ষতি হবে [পিটারের] পান্‌সী আর নেতার দরুন।**

আবার সেই দুই মিত্রশক্তির সমস্যা। যোগ-বিয়োগ কষতে গিয়ে এরিকা শিথ্যাম্ আমেরিকা আর ব্রিটেনকেও দেখতে চেয়েছে এই দুই শক্তি হিসেবে। কিংবা আমেরিকা আর সামগ্রিক পশ্চিম য়ুরোপ। সেক্ষেত্রে বর্বরশক্তি বলতে মধ্যপ্রাচ্যকেই বুঝতে চেয়েছে এরিকা।

এই মধ্যপ্রাচ্য বা প্রাচ্যের উল্লেখ এখানেও (প্রথম শতক, ৯ নং চতুষ্পদী) :

> **হাড্রিকে এবং রোমুলাসের উত্তরাধিকারীদের সমস্যায় ফেলার জন্য [মধ্য ?] প্রাচ্য থেকে আসবে আফ্রিকান হৃদয়। লিবিয়ান নৌবহরের সহযোগে জনশূন্য হবে মাল্টা ও সন্নিহিত দ্বীপগুলির মন্দিরসমূহ।**

উত্তর আফ্রিকার শাদ্ প্রভৃতি দেশে নানান সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছে লিবিয়ার কলোনেল গদ্দাফি আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা। এখানে স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত হয়েছে লিবিয়ার নাম। 'জনশূন্য দ্বীপ'কে এরিকা শিথ্যাম ভাবতে চেয়েছে লেবানন আর তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ হিসেবে। বিগত বিশ-পঁচিশ বছরের যুদ্ধের অবিরাম আঘাতে বিধ্বস্ত, জর্জরিত হয়েছে লেবানন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তিবাহিনীও চলে গেছে লেবানন ছেড়ে।

দ্বিতীয় শতকের ৮৯-তম ভবিষ্যৎকথন :

> **একদিন বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে উঠবে দুই বৃহৎশক্তি। তাদের বিপুল শক্তি বর্ধিত হবে। নতুন দেশটি উঠবে নিজের শক্তির সর্বোচ্চ শিখরে। পরিমাণ (সৈন্যের বা অস্ত্রের ?) জানানো হবে সেই রক্তমাখা মানুষের কাছে।**

দুই শক্তিকে বারবার খুঁজে পাচ্ছি। সন্দেহ থেকে যাচ্ছে—কে কে? নতুন দেশ অর্থে (ষোড়শ শতাব্দীর প্রেক্ষাপট মনে রেখে) আমেরিকা ছাড়া আর কারুকে বোঝায় না। ঐ মৈত্রীর সময়কালে ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছবে আমেরিকা। 'রক্তমাখা মানুষ' ঘুরে ফিরে সেই নেপোলিয়ঁ-হিটলারের উত্তরসূরীটির মুখেই আলো ফেলে বাতিঘরের। প্রশ্ন থাকে একটাই—আমেরিকার মিত্র সেই 'বৃহৎশক্তি'টি কোন্‌জনা? আর, প্রেসিডেন্ট বুশ কি 'রক্তমাখা মানুষ' হতে পারেন?

চতুর্থ শতকের ৫০-তম কথন :

> **পাশ্চাত্যে আধিপত্য করবে তুলারাশি, আকাশে আর মাটিতে থাকবে তার শাসন। এশিয়ার শক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস হবে না, যতক্ষণ না পর্যায়ক্রমে সপ্তমজন ক্ষমতায় আসে।**

এই চতুষ্পদীতে একটা ক্ষীণ ইঙ্গিত রয়েছে যে 'রক্তমাখা মানুষ' পাশ্চাত্যের লোক নয়। তুলার আধিপত্যের সময়ে পাশ্চাত্য—আমেরিকা বলেই ধরে নেওয়া যায়—অত্যন্ত শক্তিশালী হবে। অর্থাৎ, এই যুগই সেই সময়। 'এশিয়ার শক্তি' কোন্ দেশ? মধ্যপ্রাচ্য আছে, কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের কোন রাষ্ট্রকেই বিশ্বের বিচারে প্রকৃত শক্তি বলে ভাবা যায় না। এসে দাঁড়ায় আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রটিই : চীন। ১৯৭৬ সালে চেয়ারম্যান মাও সে-তুং-এর মৃত্যুর পর থেকে চীনের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও নানান পলিসিতে ঘটে গেছে বিপুল পরিবর্তন। ঘন ঘন নেতা বদল দেখেছি আমরা। হুয়া কুয়ো ফেং নেই। ক্ষমতায় এখন তেং শিয়াও-পিং। নস্ত্রাদামু বলতে চেয়েছেন, সপ্তম ব্যক্তিত্বটি যখন আসবে চীনের ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে, তখনই ভেঙে পড়বে লক্ষ মানুষের বুক-চেরা তপ্ত, পবিত্র রক্ত দিয়ে গড়া লাল চীনের শক্তি। ...সময়ের হাত এসে মুছে ফেলে আর সব— / নক্ষত্রেরো আয়ু শেষ হয়!

কিন্তু, এত মানুষের এত স্বপ্নে-ভেজা রক্ত-আল্‌পনা এইভাবে মুছে যেতে পারে কি? আমরা তো দেখতে চাই...মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে / জাগে একা অঘ্রাণের রাতে / সেই পাখি।

মিশেল দ্য নস্ত্রাদামু ইঙ্গিত দিয়েছেন, এরিকা শিথ্যাম করেছে তার শরীর-ব্যবচ্ছেদের চেষ্টা। ধরিত্রীর আসন্ন কৃষ্ণবর্ণ যন্ত্রণার পিছনে নিঃশব্দে

উপস্থিত এক নিশাচর: খ্রীষ্টবিরোধী তৃতীয় জনা, নেপোলিয়ঁ-হিটলারের উত্তরপুরুষ: পার্স, অথবা অ্যালিয়ুস্/ম্যাবিয়ুস্!

১৩

ছিন্নপাতার সাজাই তরণী

আকাশে মেশা এক বনস্পতির ছায়ায়, শিশিরে-ভেজা, ছড়িয়ে আছে অনেক ছিন্নপাতা। এইসব ঝরে-যাওয়া ছিন্নপাতা সাজিয়ে-সাজিয়ে তরণী বাঁধার, নাও ভাসানোর চেষ্টা এবার।

মিশেল দ্য নস্ত্রাদামুর বাছাই করা কিছু ভবিষ্যৎ কথন এতক্ষণে বলা হয়ে গেছে। গুরুত্বের বিচারে, প্রাসঙ্গিক তার বিচারে এগুলোই আমাদের টানে বেশি। কিন্তু বাদ রয়ে গেছে আরও অজস্র কথা, সুপ্রচুর ভবিষ্যৎকথন। ক্ষীণ কলেবরের এই বইতে নস্ত্রাদামুর যাবতীয় চতুষ্পদী নিয়ে আলোচনা করা শুধু অসম্ভবই নয়, অবাস্তবও বটে। এই পরিচ্ছেদে সাজিয়ে দেওয়া যাক এতক্ষণের আলোচনায় বাদ পড়ে যাওয়া কিছু চতুষ্পদী, কুড়িয়ে নেওয়া যাক শিশিরে-ভেজা কিছু ছিন্নপত্র। সাজানো যাক এলোমেলোভাবেই।

নস্ত্রাদামু লিখছেন:

> **জীবন্ত অগ্নি আর লুক্কায়িত মৃত্যু ফেলা হবে, ত্রাসজনক গোলকের ভিতরে সেগুলি বড় ভয়ঙ্কর...**

এ কথার বহুশত যুগ পরে, ভবিষ্যতের এই যাদুঘরে, হয়রান হয়ে কপাল মোছার সত্যি প্রয়োজন হয় না। কথাগুলোর মধ্যে আধুনিক মারণ-বোমাকে চিনে নিতে অসুবিধে হয় কি? পাঠক, পথ হারাইও না!

উড়ন্ত আগুনের এক যন্ত্রের কথা শুনিয়েছেন ভবিষ্যৎ-কথক। রকেট বস্তুটাকে চিনতে আমাদের সমস্যা হয় না।

অতঃপর লৌহমৎস্য। নস্ত্রাদামু লিখেছেন—দেখা যাবে লোহার মাছ, তার মধ্যে থাকবে মানুষ, আর লক্ষ্য হবে যুদ্ধ। কল্পনাশক্তিকে খেলানোর দরকার নেই—চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে সাবমেরিন।

তিনজন খ্রীষ্টবিরোধীর মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয়জন, হিটলার আর অ্যালিয়ুস/ম্যাবিয়ুস বা পার্স সম্বন্ধে আমরা নানান কথা পেয়েছি ইতিমধ্যেই। কিন্তু প্রথমজন, নেপোলিয়ঁ বোনাপার্ট প্রসঙ্গে আরও কিছু কথার খোঁজ পাওয়া যায়।

পুরোপুরি ভাবে প্রভাঁস প্রদেশের নিজস্ব ভাষায় একটাই মাত্র চতুষ্পদী লিখেছেন নস্ত্রাদামু। চতুর্থ শতকের ২৬নং চতুষ্পদী :

উদ্ভূত হবে বিরাট মৌমাছির ঝাঁক, কিন্তু কেউই জানতে পারবে না তারা কোথা থেকে এলো। রাত্রিকালে অতর্কিত আক্রমণ, দ্রাক্ষালতার নীচে সান্ত্রীরা, পাঁচজন বকুনতুড়ে গোপনে দখল ছেড়ে দেবে শহরের।

এখানে নেপোলিয়ঁর কু দেতা-র ছবি। সেই অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার, বা ৯ নভেম্বরের ঘটনা। নেপোলিয়ঁর প্রতীক ছিলো মৌমাছি। নিজের অনুগামীদের নেপোলিয়ঁ বলতেন—'মৌমাছির ঝাঁক'। ডিরেক্টরীর পাঁচজন সদস্য উৎকোচের বিনিময়ে পারির অধিকার ছেড়ে দিয়েছিলো নেপোলিয়ঁর হাতে।

অষ্টম শতকের ১ নং চতুষ্পদীতে নেপোলিয়ঁকে প্রায় তার নাম ধরে চিহ্নিত করা হয়েছে—

প্যু নে লরঁ (Pau Nay Loron) রক্তের থেকে বেশি করে আগুন দিয়েই তৈরী হবে, প্রশংসা প্রবাহে সাঁতরানোর জন্য সেই বিরাট জনকে পালাতে হবে [নদীর] সঙ্গমে। ম্যাগ্‌পাইদেরকে সে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। প্যাম্পঁ এবং দুরাঁস তাদেরকে বন্দী করে রাখবে।

Pau, Nay, Loron—পশ্চিম ফ্রান্সে এই নামে তিনটে শহরও আছে। আবার সাজানোর হেরফেরে দাঁড়ায় : Napaulon Roy, অর্থাৎ রাজা নেপোলিয়ঁ। ম্যাগ্‌পাই প্রসঙ্গটাও কৌতূহলোদ্দীপক। প্রভাঁসের ভাষায় শব্দটা ছিলো 'Agassas', agassa অর্থাৎ ম্যাগ্‌পাই। মূল ফরাসী ভাষায় ম্যাগ্‌পাইকে বলা হয় 'পাই', আর ফরাসীতে 'Pius'-এর উচ্চারণও 'পাই'। এবং এই 'পাই' নামে পোপ ছিলেন কয়েকজন—মনে রাখছি আমরা। ষষ্ঠ পাই ও সপ্তম পাইকে বন্দী করেছিলেন নেপোলিয়ঁ। নদী-সঙ্গম বলতে মনে আসে

ভ্যালেঁস-এর কথা, যেখানে মিশেছে রোন্ আর আইসির নদী, আর এইখানেই ১৭৯৮-৯৯ সালে মৃত্যু হয়েছিলো ষষ্ঠ পাই-এর!

মাস, তারিখ নির্ভুলভাবে উল্লেখ করে, এক হত্যাকাণ্ডের ছবি লিখেছেন ভবিষ্যদ্বক্তাদের রাজা :

ফসানো থেকে আগত নেতার গলা কাটবে এমন এক ব্যক্তি যার কাজকর্ম ব্লাড্হাউণ্ড আর গ্রেহাউণ্ডদের নিয়ে। এ কাজ করবে টার্পিয়ান রকের লোকেরা, যখন ১৩ই ফেব্রুয়ারীতে শনি প্রবেশ করবে সিংহরাশিতে।

ফসানোর নেতাকে খুঁজে বার করা খুব সহজ নয়। বেরীর ডিউকের মাতামহ ছিলেন সার্ডিনিয়া অঞ্চলের ফসানোর রাজা। সেই সূত্রে বেরীর ডিউককে ফসানো থেকে আগত বলা যায়। এই ডিউককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়। তারিখটা ছিল ১৮২০ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী। হত্যাকারীর নাম ছিলো লুভেল্, আর সে ছিলো রাজ-আঁস্তাবলের কর্মচারী! ব্লাডহাউণ্ড-গ্রেহাউণ্ড না হলেও, আঁস্তাবলে তো তাকে পশুদের নিয়েই কাজ করতে হতো। প্রাচীন রোম প্রজাতন্ত্রে অপরাধীদের ছুঁড়ে ফেলা হতো টার্পিয়ান পাহাড় থেকে। লুভেল্ ছিলো প্রজাতন্ত্রী—ক্ষীণ একটা সাদৃশ্য চোখে পড়ে। শনির প্রাধান্য কুম্ভের ওপর। যখন সে বিপরীত চিহ্ন সিংহে প্রবেশ করে, তখন জ্যোতিষ বিজ্ঞানের মতে তা এক অমঙ্গলের ইঙ্গিতই বয়ে আনে।

পঞ্চম শতকের ২৯নং চতুষ্পদীতে আবার হিস্টার (হিটলার)—

স্বাধীনতা পুনরর্জিত হবে না; তা দখল করবে এক কৃষ্ণবর্ণ, গর্বোদ্ধত, দুর্বৃত্ত ও অন্যায়কারী ব্যক্তি। হিস্টার যখন পোপের প্রসঙ্গ আনবে, তখন দীর্ঘ আলোচনা হবে ভেনিস শহরে।

১৯৩০-এর দশকে হিটলারের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হওয়ার জন্য ইতালির বেনিতো মুসোলিনীর প্রচেষ্টার ঠিকানা মেলে এখানে। দুই একনায়কের সাক্ষাত হয়েছিলো ভেনিস শহরেই। মুসোলিনীর এক নিখুঁত বর্ণনাও রয়েছে চতুষ্পদীটিতে। কৃষ্ণবর্ণ বা কালো বলতে দুষ্ট লোক বোঝায়, এবং আরও কিছু বোঝায়। মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ত বাহিনীর পোশাক ছিল কালো জামা—ব্ল্যাক শার্ট! হিটলারের দেহরক্ষী বাহিনী S.S-এর পোশাকও ছিলো

কালো রঙের। পোপের সঙ্গে মুসোলিনীর চুক্তি হয়েছিল ১৯২৮ সালে। নাজি যুদ্ধবাজদের দক্ষিণ আমেরিকার দিকে পালানোর সুযোগও করে দিয়েছিলেন পোপ দ্বাদশ পায়াস।

এবার অন্য প্রসঙ্গ ছোঁয়া যাক।

ডাল্‌মাসিয়ায় প্রস্তুত হবে দুগ্ধ, রক্ত, ব্যাঙ। যুদ্ধ চলবে, ব্যালেনেস্‌-এর কাছে মহামারী। স্লাভোনিয়ার সর্বত্র নির্মিত হবে এক বিরাট শহর—অতঃপর র‍্যাভেনার কাছে জন্ম নেবে এক দানব।

অ্যাড্রিয়াটিকের আশপাশের অঞ্চলের শব্দই শোনা যাচ্ছে এখানে। ডাল্‌মাসিয়া হচ্ছে অ্যাড্রিয়াটিকের পূর্বপ্রান্তে, ব্যালেনেসের নাম ছিল ট্রেবুলা, কাপুয়ার কাছাকাছি ব্যালিন্‌সিস, আর র‍্যাভেনা তো মধ্য ইতালিতে। পূর্বতন স্লাভোনিয়ার কিছু অংশ এখন উত্তর যুগোশ্লাভিয়ায় আর বাকিটুকু হাঙ্গেরীর মধ্যে।

১৯৫৪ সালে ইংল্যাণ্ডের বার্মিংহ্যামের সাটন্‌ পার্কে বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে 'ব্যাঙ বৃষ্টি' দেখা গিয়েছিলো। ১৯৮৩ সালের ২ জানুয়ারি আর্কান্‌সাস্‌ অঞ্চলেও বৃষ্টির সঙ্গে ঝরে পড়েছিল বেশ কিছু ব্যাঙ। লোকে বলেছিল, 'যেন একেবারে আকাশ থেকেই নেমে এলো ব্যাঙগুলো।' ১৯৬৮-র ২৭ অগাস্ট তারিখে ব্রাজিলের কক্‌পাভা আর সাও হোমে দম্‌ ক্যাম্পোস অঞ্চলের মাঝের এলাকাটুকুতে পাঁচ-সাত মিনিট ধরে রক্ত আর মাংসের টুকরো ঝরে পড়ে মহাশূন্য থেকে। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছিল—মাংসটা মানুষের। কিন্তু কাছাকাছি কোথাও কোন বিমান দুর্ঘটনা তখন ঘটেনি। ১৮৮০ সালে মরক্কোতেও মানুষ দেখেছিল রক্তের বৃষ্টি। বিজ্ঞানের পথ তন্নতন্ন করে ঘাঁটলে হয়তো কোন যথাযথ ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। কিন্তু আমরা দেখছি—এই রকম অদ্ভুত ব্যাপারের কথাও আগে-ভাগে লিখে গেছেন নস্ত্রাদামু।

প্রথম শতকের ৫৩নং চতুষ্পদীতে আজকের মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর তৈল সম্পদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চতুর্থ শতকের ৮০নং চতুষ্পদী বলতে চায় ফ্রান্সের ম্যাজিনো লাইন-এর কথা।

বাকি থাকে অনেক কিছু। অতীত বহু কিছু প্রমাণ করেছে, বাকিটুকু প্রমাণ করুক ভবিষ্যৎ। আমরা শুধু চাই—ভবিষ্যৎ ভুল বলে প্রমাণ করুক মিশেল নস্ত্রাদামুকে। আমরা এক আলোয়-ধোয়া পৃথিবী চাই। নস্ত্রাদামুর বাতিঘরে আঁধার ছাড়া যে আর কিছুই নেই!

নস্ত্রাদামুর ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ে নানান কম্পিউটারের সাহায্য নিয়েছিল এরিকা শিথ্যাম্‌। কম্পিউটারের বিচারে ঐ-সব ভবিষ্যদ্বাণীর

'বিশ্বাস-যোগ্যতার মাত্রা' (credibility reading) ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ!

১৪

আগামী পৃথিবী কান পেতে তুমি শোনো

এবার একেবারে পৃথিবীর সাম্প্রতিক ঘটনাস্রোত আর আগামী দিনের কথকতা। ভবিষ্যদ্বক্তাদের রাজা ঠিক কী কী বলে গেছেন এই ১৯৯০-এর দশকের পৃথিবী সম্বন্ধে, দুয়ারে কড়া নাড়া একবিংশ শতাব্দীর কোন্ ছবি ফুটেছে তাঁর ক্যানভাসে—দেখা দরকার। চারশ বছর আগের যে মানুষটির ভবিষ্যদ্বাণীর বিশ্বাসযোগ্যতার মাত্রা আজকের কম্পিউটারের বিচারে ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ, তার চোখে পৃথিবীর আসন্ন চেহারাটা তো দেখতে চাইবেই মানুষ। আপাতত আমাদের তালাস সেই লক্ষ্যেই, যে গানে আগামী পৃথিবী কান পেতে শোনে সেই মানুষের কণ্ঠস্বর।

> **ন' বছর ধরে চলবে কৃশকায় জিনিসটির তাণ্ডব, তারপর তার তৃষ্ণা এত তীব্র হয়ে উঠবে যে এক বিরাট আইনহীন দেশ শেষ হবে তার কারণে; তাকে হত্যা করবে এক উৎকৃষ্ট চরিত্রের মানুষ।**
> **(দ্বিতীয় শতক, ৯ম চতুষ্পদী)**

কিসের দিকনির্দেশ? তলিয়ে ভাবলে মনে পড়ে সাম্প্রতিক কালের এক মারণ ব্যাধির কথা, নাম যার এড্‌স্ (A I D S)। এ রোগের প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল সম্ভবত আফ্রিকায় আর সেখানকার বাসিন্দারা রোগটাকে চিহ্নিত করত 'কৃশকায়' ব্যাধি নামে। কিন্তু ন বছর কথাটার মানে কী? রোগটা যথাযথভাবে চিহ্নিত করতে বিজ্ঞানীদের ন বছর লেগেছে? নাকি এ রোগে আক্রান্ত মানুষদের জীবনের মেয়াদ বড়জোর ন বছর? এড্‌সের তাণ্ডবে কোন দেশ শেষ হয়ে যাবে বা উজাড় হয়ে যাবে, এটা ভাবা নেহাতই কষ্টকল্পনার সামিল। তবে বিশেষত আফ্রিকা আর আমেরিকায় যে হারে ছড়িয়ে পড়ছে এই মারণ ব্যাধি, তাতে ব্যাপক প্রাণহানির সম্ভাবনাটা দিন

দিন আরও বাস্তব হয়ে উঠছে। চতুষ্পদীর শেষ পঙ্ক্তিতে আশার ঝিলিক ঐ মারণ ব্যাধিই শেষ কথা হবে না, আবিষ্কৃত হবে তাকে প্রতিহত করার উপায়। আমরা জানি, সে প্রচেষ্টা চলছে আজ সারা দুনিয়ায়। বিজ্ঞানীরা উঠে পড়ে লেগেছেন এ রোগ প্রতিহত করার উপায় উদ্ভাবনের জন্যে। নস্ত্রাদামু বলছেন, সফল হবেন বিজ্ঞানীরা।

দ্বিতীয় শতকের ৭৮-তম চতুষ্পদীতেও এই ভয়াবহ মারণ-ব্যাধির ইঙ্গিত :

সমুদ্রের গভীর থেকে মহান নেপচুন ; আফ্রিকান জাতি ও ফরাসি রক্তের মিশ্রণ, ধীরে-চলা জিনিসটির কারণে দ্বীপগুলি রক্তাক্তই রয়ে যাবে। একেবারে লুকোনো গোপনতার থেকেও এটা তার বেশি ক্ষতি করবে।

অন্যত্র নেপচুন শব্দটিকে নস্ত্রাদামু ব্যবহার করেছেন তুরস্কের অর্থাৎ মুসলিম নৌ-বহরের প্রতীক হিসেবে। জলদস্যুদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে এ ইঙ্গিতের। আর ঐ 'ধীরে চলা জিনিসটি' ? এড্স ? আফ্রিকা থেকে ফ্রান্স অর্থাৎ য়ুরোপে এসেছে এড্স। আক্রান্তদের কাছে রোগটা অনেকদিন ধরেই 'একেবারে লুকোনো গোপনতা' হয়েই থাকে।

দুটি মহান চন্দ্রের গ্রহণের অল্পদিন পরেই দেখা যাবে লক্ষণ যা ঘটবে মার্চ ও এপ্রিলের মধ্যে, কি নিদারুণ ক্ষতি। কিন্তু দুটি বৃহৎ শুভ প্রভাব সব পক্ষকে সাহায্য করবে, স্থলপথে ও জলপথে।

(তৃতীয় শতক, ৫ম চতুষ্পদী)

এর ঠিক আগের চতুষ্পদীতে দুটি মুসলিম রাষ্ট্রের ইঙ্গিত দিয়েছেন নস্ত্রাদামু, যে দুটি রাষ্ট্রকে ইরান আর ইরাক বলে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। এখানেও ইরান-ইরাকের ছায়া আর সম্ভবত এই দুটি রাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের যুদ্ধের অবসান ঘটার ছবি। মার্চ এপ্রিল নাগাদ ঘটবে বৈরিতার অবসান। ১৯৯১-এর একেবারে গোড়ায় ইরাক আমেরিকা যুদ্ধের সময়, আমরা দেখেছি, ইরাকের যুদ্ধবিমানগুলো আশ্রয় পেয়েছিল ইরানের মাটিতে। সে যুদ্ধে ইরাকের বিরুদ্ধে যোগ দেয়নি ইরান, বরং তার সমর্থন ছিল ইরাকের দিকেই । আর ঐ দুটি বৃহৎ শুভ প্রভাব সম্ভবত আমেরিকা আর ব্রিটেন, স্থলপথে আর আকাশপথে যারা ছিন্নভিন্ন করেছে ইরাককে। প্রভাবটা হয়ত শুভই, তবে

নেতিবাচক অর্থে। আমেরিকা ব্রিটেনের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছে ইরাক আর পাশের রাষ্ট্রটির এই বিপর্যয়ে বিচলিত ইরান তার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে প্রচ্ছন্ন সাহায্যের হাত।

য়ুরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভাসানো এক ভয়াবহ বন্যার কথা শোনা যায় তৃতীয় শতকের দ্বাদশ চতুষ্পদীতে। নস্ত্রাদামু লিখছেন :

> **এব্রো, পো, ট্যাগাস, টাইবার এবং রোন্ এর জলোচ্ছ্বাসের দরুন; জেনেভা ও আরেজো-র লেকের ধারে গ্যারোনের দুটি বড়, প্রধান শহর অধিকৃত, মৃত, নিমজ্জমান। ভাগ করা হবে লুণ্ঠিত মানুষদের।**

এ চতুষ্পদীর নানান শব্দে স্পেন, পর্তুগাল, ইতালি আর ফ্রান্সের দিকনির্দেশ। অর্থাৎ, প্রবল বন্যায় প্লাবিত হবে য়ুরোপের সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল। শেষের সেদিন এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে? আরও কিছু ভবিষ্যৎকথনে য়ুরোপ-জোড়া এই বন্যার ছবি এঁকেছেন মিশেল দ্য নস্ত্রাদামু।

এ বইয়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত তৃতীয় শতকের ৫৮তম চতুষ্পদীটিকে ব্যাখ্যা করা যায় অন্য আলোতেও। এখানে আর একবার উদ্ধৃত করা যাক চতুষ্পদীটি :

> **নরিকান্ পর্বতমালায়, রাইন-এর কাছাকাছি জন্ম নেবে এক বিরাট নেতা ; বড় দেরিতে আসবে সে। পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীকে সে রক্ষা করবে আর তার পরিণতির কথা কেউ কখনও জানতে পারবে না।**

আগের ব্যাখ্যায় এই নেতাকে আমরা দেখতে চেয়েছি হিটলার হিসেবে। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি অঙ্গুলী নির্দেশ করছে আর-একজনের দিকেও : পোল্যাণ্ডের জননায়ক লেচ ওয়ালেসা (সঠিক উচ্চারণে সম্ভবত লেখ ভাওয়েন্সা)। লাতিন ভাষায় নরিকান শব্দটি অস্ট্রিয়াকেই বোঝায়। অস্ট্রিয়ান পর্বতমালার অন্য দিকেই পোল্যাণ্ড ওয়ালেসার জন্মস্থান। পোল্যাণ্ড কাঁপানো আন্দোলন সলিডারিটির প্রতিষ্ঠাতা ওয়ালেসাই। এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত রঙ বদলে দিয়েছে পোল্যাণ্ডের, দেশের অবিসংবাদী নেতা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন লেচ ওয়ালেসা। সে দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে এসে দাঁড়াতে

কিছুটা দেরি তো হয়েইছে তাঁর। পোল্যাণ্ডের পরিস্থিতি অনেক আগে থেকেই দাবি করছিল এ-রকম একজন নেতার। নস্ত্রাদামু ইঙ্গিত দিয়েছেন একইরকম ঘটনাস্রোতে প্লাবিত হবে হাঙ্গেরিও। ইঙ্গিত পরিণত হয়েছে সত্যে। রঙ বদল ঘটেছে হাঙ্গেরিরও। শুধু হাঙ্গেরিই নয়, পরিবর্তনের স্রোতে গা ভাসিয়েছে গোটা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াই।

ভয়ঙ্কর, আরও ভয়ঙ্কর। সেই যুদ্ধ, সেই রক্ত: আমাদের আগামী দিন ভেসে যাবে চোখের জলে। অশ্রু, মৃত্যু। অশ্রু আর মৃত্যু আর সব—ধ্বংসের নিঠুর গান। এবং, আবার এশিয়া।

সমগ্র এশিয়া জুড়ে দেখা দেবে ব্যাপক নির্বাসিন, দেখা দেবে মাইসিয়া, লাইসিয়া আর পাম্ফালিয়াতেও। অশুভতায় পরিপূর্ণ এক কৃষ্ণবর্ণ যুবকের জন্য বয়ে যাবে রক্তস্রোত।

(তৃতীয় শতক, ৬০-তম চতুষ্পদী)

প্রাচ্যে এক ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতির কথাই যেন ফুটে উঠেছে এই চতুষ্পদীতে। উল্লিখিত দেশগুলি প্রাচীন এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত। প্রাচীন এশিয়া মাইনর বলতে আজকের তুরস্ক, ইরাক আর ইরান। ও অঞ্চলে যুদ্ধ তো লাগাতার খবর। আরও বড় কোন যুদ্ধ আসছে? কে সেই যুবক? সাদ্দাম হুসেন? এই যুবকই সেই খ্রীষ্টবিরোধী তৃতীয়জন, নাকি তার আগমনের বার্তাবহ? এশিয়ায় সামরিক প্রস্তুতির কথায় চীনের নামটাও ভেসে উঠতে পারে চোখের সামনে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনার সঙ্গে বারবার জড়িয়ে পড়ছে এশিয়া নস্ত্রাদামুর চোখে।

আবার ইরাক।

ক্রশের সম্প্রদায়ের অনুগমন দেখা দেবে মেসোপটেমিয়ায়। কাছাকাছি থাকা নদীটির হাল্কা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত কম্পানিটি (সৈন্যদল?) এ-রকম আইনকে শত্রুভাবাপন্ন বলে মনে করবে।

(তৃতীয় শতক, ৬১তম চতুষ্পদী)

মেসোপটেমিয়া অথাৎ ইরাক। নদী তো আছেই—টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস। কিন্তু ক্রশের সম্প্রদায় কি খ্রিশ্চিয়ান সম্প্রদায়? ইরাকে খ্রিশ্চিয়ান অনুপ্রবেশ? ইরাকিদের বিরোধিতা? এই ১৯৯১-এর গোড়ার সেই বহু-আলোচিত যুদ্ধের

ছবিই তো ফুটতে দেখছি। বা, সামনে আসছে আরও বড় কোন ঘটনা।

ঠিক এই মুহূর্তের পৃথিবীর অতি বাস্তব ছবি তৃতীয় শতকের ৯৫-তম চতুষ্পদীতে :

> **পতন ঘটবে মুরিশ্ আইনের, তারপর আসবে আরও অকরুণ এক আইন। অধিকতর মর্মস্পর্শী আরেকজনের কাছে নিপারই প্রথম এগিয়ে যাবে উপহার আর বক্তব্য নিয়ে।**

কোন্ আইনের পতনের প্রতিধ্বনি এখানে—চিনতে অসুবিধে হচ্ছে? য়ুরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে চিনে নিতে খুব একটা অসুবিধে কিন্তু হওয়ার কথা নয়। একটার পর একটা দেশ রঙবদল করেছে, পতন ঘটেছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার। যে-কোন কারণেই হোক, পরিবর্তনটা হয়ত অবশ্যম্ভাবীই হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পরিবর্তন ঘটে বিভিন্ন দেশে যে ধরনের ব্যবস্থা মাথাচাড়া দিচ্ছে, সেটাও তো খুব কাম্য ছিল না। অর্থাৎ, আরও অকরুণ একটা-কিছু এসে দাঁড়াচ্ছে সামনে। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে নস্ত্রাদামুর নিজস্বতা লক্ষ্য করার মতো। তিনি বলেছেন—প্রথম এগিয়ে আসবে নিপার, নিয়ে আসবে বক্তব্য। নিপার শব্দটি নিখুঁত ভাবে চিহ্নিত করে একটিই দেশকে : রাশিয়া। য়ুরোপের সমাজতান্ত্রিক শিবিরের এই পরিবর্তনের পথিকৃৎ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় রাশিয়াকেই। বক্তব্য বলতে পাঠকের মনে পড়তেই পারে বহু-আলোচিত গ্লসনস্তের কথা।

বিভিন্ন চতুষ্পদীতে রুশ-মার্কিন মৈত্রীর কথা বলেছেন নস্ত্রাদামু। তাঁর হিসেব মতো সে মৈত্রী স্থায়ী হবে তিন বছর সাত মাস। পঞ্চম শতকের ২২-তম ভবিষ্যৎকথনে আবার অন্য এক মৈত্রীর ইশারা।

> **মহান মানুষটি রোমে মারা যাওয়ার আগে, বিদেশী ফৌজের মধ্যে দেখা দেবে প্রবল ভীতি। পার্মার কাছাকাছি ঘটবে সৈন্যবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণ। তারপর লাল দুজন ভোজ সারবে একসঙ্গে।**

মহান মানুষ বলতে, নস্ত্রাদামুর চোখে, সম্ভবত পোপকেই বোঝায়। সাদা বাংলায়, কোন-একজন পোপ মারা যাওয়ার আগে বিদেশে যুদ্ধ-টুদ্ধ কিছু-একটা ঘটবে। আর ঐ লাল দুজন? আজকের পরিভাষা অনুযায়ী

ভাবতে গেলে চোখে পড়ে সোভিয়েত রাশিয়া আর চীনের ওপরেই। এই দুই শক্তি একসঙ্গে ভোজ সারবে, অর্থাৎ, হাতে হাত মেলাবে রাশিয়া আর চীন। নস্ত্রাদামু কথিত রুশ-মার্কিন মিতালী ভেঙে যাওয়ার পর কি তাহলে একসূত্রে বাঁধাই পড়বে চীন-রাশিয়া?

পঞ্চম শতকের ২৩-তম চতুষ্পদীতে কৌতূহলোদ্দীপক ইঙ্গিত:

যখন বেশিরভাগের (গ্রহের) সংযোগ ঘটবে মঙ্গলের সঙ্গে, তখন ঐক্যবদ্ধ হবে পরিতৃপ্ত মানুষ দুটি। আতঙ্কে কম্পিত হবে আফ্রিকান নেতাটি। দুজনের মৈত্রীকে ভেঙে দেবে নৌবহর।

আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে আফ্রিকা পর্যন্ত—হয়ত সেই তৃতীয় খ্রীষ্টবিরোধীর রণহুঙ্কারেই। আর, এই চতুষ্পদী যেন বলতে চাইছে, রুশ-মার্কিন সমঝোতা ভেঙে পড়বে নৌবাহিনী সংক্রান্ত কোন কারণেই। হয়ত বা উপসাগর অঞ্চলেই কোন গুরুতর সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়বে রাশিয়ান আর মার্কিন নৌবহর—যে বিপদের হাত থেকে পৃথিবী রক্ষা পেয়েছে ১৯৯১-এর উপসাগরীয় যুদ্ধে।

পঞ্চম শতকের ৪৬-তম কথন:

যখন স্যাবাইনের লোকটি নির্বাচিত হবে, তখন লালটুপিওয়ালারা সৃষ্টি করবে কলহ আর নতুন নতুন ধর্মীয় বিভেদ। তার বিরুদ্ধে কুতর্কের ঝড় তুলবে তারা। আলবানিয়ার এই লোকেদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে রোম।

এ চতুষ্পদীর একটা অংশ মিলে গেছে নির্ভুল, আর-একটা অংশ এখনও ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায়। এরিকা শিথ্যাম্ এ চতুষ্পদীর ব্যাখ্যায় বলেছে—স্যাবিনয়েস্ অর্থাৎ রোমের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল থেকে রোমান ক্যাথলিক চার্চের কোন কার্ডিনাল নির্বাচিত হওয়ার পর তাদের নিজেদের মধ্যে বিভাজন দেখা দেবে। এই ব্যাখাটুকু দেওয়ার পরই আলবানিয়াকে নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়েছে এরিকাকে, আর এগোতে পারেনি সে। একটু অন্য চোখে দেখলে কিন্তু অন্য একটা ব্যাখ্যায় পৌঁছানো খুব কঠিন নয়। লালটুপিওয়ালা বলতে যদি আজকের দিনের কমিউনিস্টদের ধরে নেওয়া যায়, তাহলেই চোখে পড়ে এগোনোর পথটা। আলবানিয়া সমাজতান্ত্রিক

রাষ্ট্র। একসময় খুব কট্টরপন্থী বলেও পরিচিত ছিল। ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল সমাজতান্ত্রিক আলবানিয়া। ১৯৬৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি আলবানিয়ার কর্ণধার আনোয়ার হোজা ঘোষণা করেছিলেন—আলবানিয়া আজ থেকে নিরীশ্বরবাদী দেশ। পৃথিবীতে এই প্রথম কোন দেশ নিজেকে নিরীশ্বরবাদী হিসেবে ঘোষণা করল। আলবানিয়ার সংবিধানে স্বীকৃতি ছিল না কোন ধর্মের। ভাঙচুর হয়েছিল অজস্র গির্জা, বন্দী হয়েছিলেন বহু যাজক। ভবিষ্যদ্বাণীর কলহ, ধর্মীয় বিভেদ বা কুতর্কের ঝড় (আজকের আধুনিক মনন অবশ্য একে কুতর্ক না বলে বিতর্কই বলতে চাইবে) সংক্রান্ত অংশটা মিলে গেছে, দেখা যাচ্ছে। বাকি থাকে শেষ লাইনটা। আলবানিয়া ক্ষতি করবে রোম অর্থাৎ ইতালির। এই অংশটুকুর মেলা না-মেলার জন্য ভবিষ্যতে চোখ মেলা ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারি আমরা।

ষষ্ঠ শতকের ২৪-তম ভবিষ্যদ্বাণীতে আমাদের জন্য দু-চারটে আশার ফুলকি ছড়িয়ে দিয়েছেন মিশেল দ্য নস্ত্রাদামু—অবশ্যই যথানিয়মে কিছু অন্ধকার ডিঙিয়ে।

সংযোগ ঘটবে মঙ্গল আর রাজদণ্ডের, কর্কটের প্রভাবে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। অল্পদিন পরেই নির্বাচিত হবে এক রাজা যে পৃথিবীতে দীর্ঘদিনের জন্য শান্তি নিয়ে আসবে।

রাজদণ্ড বলতে যে বৃহস্পতিকেই বোঝানো হচ্ছে, সেটা ধরেই নেওয়া যায়। উল্নার-এর হিসেব মতো বৃহস্পতি আর মঙ্গলের সংযোগ আগামী দিনে মাত্র একবারই ঘটবে—২০০২ সালের ২১ জুন তারিখে। লক্ষ্য করুন, তারিখটা বিংশ শতাব্দী পার হয়ে একবিংশ শতাব্দীকে ছুঁয়েছে। সেই সময়ই কর্কটের প্রভাবে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। কর্কটের প্রভাব থাকবে ঐ বছরের ২২ জুন থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত। তারপর, শান্তি। দীর্ঘস্থায়ী শান্তি। অবশেষে উল্নারের গনণা যদি নির্ভুল হয়ে থাকে, তাহলে, নস্ত্রাদামুর চোখে, একবিংশ শতাব্দীতেও একটা ভবিষ্যৎ আছে পৃথিবীর, মানুষের। আছে শান্তি, শঙ্খমালা-শান্তি, চোখে তার যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার....। এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায়নাকো আর। হিজল-কাঠের রক্তিম চিতা—যে আগুনে পুড়ে যায় দখিন-শিয়রে মাথা শঙ্খমালা—পার হয়ে, কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে এসে ডাকে সেই নারী শান্তি-শঙ্খমালা।

কিন্তু এখানে-সেখানে এক-আধ টুকরো শান্তির ঝলক চোখে পড়লে

ও শেষ বিচারে শান্তির বার্তাবহ নন মিশেল দ্য নস্ত্রাদামু। অন্ধকার ঘরে বসে তিনি যেন দেখতেন শুধু অন্ধকারেরই ছবি, শুনতেন শুধুই আঁধারী-আওয়াজ। অষ্টম শতকের ১৭-তম চতুষ্পদীতে তিনি বলছেন :

যারা নিশ্চিন্তে আছে তাদের হতাশ হতে হবে সহসাই, তিন ভ্রাতা সঙ্কটে ফেলবে পৃথিবীকে। তাদের শত্রুরা দখল করে নেবে বন্দর-শহরটিকে। ক্ষুধা, আগুন, রক্ত, মহামারী ; যাবতীয় অশুভ জিনিস দ্বিগুণ বর্ধিত হবে।

তিন ভ্রাতা। বর্শামুখ সেই কেনেডি পরিবারের দিকেই। ক্ষমতায় আসীন অবস্থায় একজন নিহত, দ্বিতীয়জন নিহত ক্ষমতার দিকে যাওয়ার পথে আর শেষজন ক্ষমতা থেকে অনেক দূরে। কেনেডি পরিবার, অর্থাৎ দেশটা আমেরিকা। কোন্ বন্দর-শহর দখল করে নেবে তাদের শত্রুরা? সম্ভবত হংকং। চুক্তি অনুযায়ী ১৯৯৭ সালে হংকংকে ফেরত দিতে হবে চীনের হাতে।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংঘাতের কথা বারবার ফিরে ফিরে এসেছে প্রফেসিজ-এ। অষ্টম শতকের ৫৯-তম চতুষ্পদীতেও সেই ছবি :

দুবার বেরিয়ে এসে এবং দুবার আহত হয়েও পশ্চিমকে দুর্বল করবে পূর্ব। তার প্রতিপক্ষ, বেশ কিছু যুদ্ধের পর, সমুদ্রপথে তাড়া খেয়ে ব্যর্থ হবে প্রয়োজনের সময়।

প্রাচ্যের কোন শক্তি দু'দুবার আক্রমণ করবে পাশ্চাত্যের কোন শক্তিকে। প্রাচ্যের শক্তি বলতে হয়ত সেই অজানা তৃতীয় খ্রীষ্টবিরোধীর কথাই বলতে চেয়েছেন নস্ত্রাদামু। তবে শেষপর্যন্ত পাশ্চাত্যের নৌশক্তির কাছে হার মানতে হবে প্রাচ্যের শক্তিটিকে।

এবার এমন একটা ভবিষ্যদ্বাণী, যা নিয়ে অনেক হিসেব-নিকেশ চলতে পারে। অষ্টম শতকের ৭৪-তম চতুষ্পদী

এক রাজা এক নতুন দেশে প্রবেশ করার অনেক আগেই নাগরিকরা এগিয়ে আসবে তাকে স্বাগত জানানোর জন্য। তার বিশ্বাসঘাতকতার ফল এমন হবে যে সেখানকার নাগরিকদের

কাছে সেটা উৎসবের পরিবর্তে শুধু মাত্র অভ্যর্থনা হয়েই রয়ে যাবে।

আমরা আগেও বলেছি, নতুন দেশ বলতে নস্ত্রাদামুর সময়ের হিসেবে আমেরিকার নামটাই ভেসে ওঠে চোখের সামনে। সত্যিই যদি এ চতুষ্পদী অঙ্গুলীনির্দেশ করে আমেরিকার দিকে, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এ-রকম: কোন দেশের কোন এক নামজাদা নেতার পদার্পণ ঘটবে আমেরিকায়, আমেরিকানরা উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাবে তাকে, অথচ সেই অতিথিটি সারাক্ষণই মনে মনে বুনে চলবে চক্রান্তের জাল, বিশ্বাসঘাতকতার ছক। কে সেই নেতা? এরিকা শিথ্যাম্ প্রশ্ন তুলেছে—গর্বাচেভ নয়তো? উত্তর তার জানা নেই। জানা নেই আমাদেরও। হিসেব মেলানোর চেষ্টা করুন সচেতন পাঠক।

এই নতুন দেশ অর্থাৎ আমেরিকা প্রসঙ্গে আর-একটা চমক-লাগানো ভবিষ্যদ্বাণী খুঁজে পাওয়া যায় নবম শতকের ৯২-তম চতুষ্পদীতে:

নতুন শহরটিতে প্রবেশ করতে চাইবেন রাজা, তারা এটিকে এর শত্রুদের সাহায্যে পদানত করতে চাইবে। একজন বন্দী, তাকে কথা বলতে ও কাজ করতে হবে অকারণে। শত্রুদের থেকে দূরে বাইরে থাকবেন রাজা।

নতুন শহর বলতে মনে পড়ে নিউ ইয়র্কের কথাই। এ ভবিষ্যদ্বাণী ইঙ্গিত দিচ্ছে, আক্রান্ত হবে নিউ ইয়র্ক। নিউ ইয়র্কের জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে দূষিত করে এ শহরের ওপর আক্রমণ চালানোর কথা অন্যত্রও বলেছেন নস্ত্রাদামু। রাজা থাকবেন বাইরে। রাজা বলতে এখানে সম্ভবত আমেরিকার রাষ্ট্রপতিকেই বোঝানো হয়েছে। শহর থেকে দূরে কোন একটা গোপন বাংকারে হয়ত থাকতে হবে তাঁকে, সেখানে বসেই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যুদ্ধের গতিবিধি।

আবার এক টুকরো শান্তির কথা:

ইঁটের দেওয়ালগুলি পরিণত হবে মার্বেল পাথরের দেওয়ালে, পঁচাত্তরটি শান্তিময় বছর মানবজাতির আনন্দ, কৃত্রিম জল-প্রণালীটি আবার উন্মুক্ত। সুস্বাস্থ্য, প্রচুর ফল, আনন্দ এবং সুমধুর সময়।

(দশম শতক, ৮৯-তম চতুষ্পদী)

এই বিংশ শতাব্দীর ওপারে প্রতীক্ষা করছে যে শতায়ু অতিথিটি, সেই একবিংশ শতাব্দীর মানুষ অবশেষে খুঁজে পাবে তার চিরদিনের চাওয়া শান্তির ঠিকানা—এই আশ্বাসই কি শোনাতে চাইছেন ভবিষ্যদ্বক্তাদের রাজা?

কিন্তু, বারবার দেখেছি আমরা, শান্তির দুয়ারে থামতে জানেন না মিশেল দ্য নস্ত্রাদামু। তাঁর ভবিষ্যৎমুখী চোখ দুনিয়ার আনাচ-কানাচ থেকে ঠিক খুঁজে নেয় কোন ধ্বংসের বীজ। তাই দশম শতকের ৯৯-তম চতুষ্পদীতে তিনি হুঁশিয়ারি দেন:

নেকড়ে, সিংহ, বলদ এবং গর্ধভের অবসান, ভীরু হরিণ নিপতিত হবে ম্যাস্টিফ্‌দের মধ্যে। তাদের বরাতে আর জুটবে না উৎকৃষ্ট খাদ্য। ম্যাস্টিফ্‌দের আরও বেশি সতর্কতা এবং প্রহরা।

আগের চতুষ্পদী বলছে—সুসময় আসবে। আর এখানে তার বিদায়-ঘণ্টা। শেষ হবে শতাব্দী পেরোনো সেই শান্তির দিন, এগিয়ে আসবে সতর্কতার লগ্ন।

ধায় রাত্রি ধায় রাত্রি.... যজ্ঞভূমে কাটা আঙুল লকলকিয়ে বৃক্ষ আঁচড়ায়। সব মিলিয়ে এ ঘোর কালো ছবিটিই শুধু এঁকে গেছেন মিশেল দ্য নস্ত্রাদামু।

আমাদের যে ভবিষ্যৎ এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে, তার আরও কিছু ইঙ্গিত রয়ে গেছে প্রফেসিজ-এর পৃষ্ঠায়। আছে দক্ষিণ ফ্রান্সে, ইতালিতে তীব্র ভূমিকম্পের কথা, সেই ভূমিকম্পের পরে পরেই বন্যার কথা (বন্যা প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে এই ১৯৯১ সালে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের বিধ্বংসী ঝড় আর বন্যার কথা যার বিষথাবায় প্রাণ হারিয়েছে ৫ লক্ষেরও বেশি মানুষ), ইরাকের উদ্বাস্তু কুর্দদের সমস্যার কথা, বিভিন্ন ধর্মের বিভ্রান্তির ইঙ্গিত, ইতালির কাছাকাছি কোন-এক জায়গায় একটা নৌবহরের বিপাকে পড়ার ছবি, পোপ দ্বিতীয় জন্ পলের নিহত হওয়ার ইঙ্গিত (ইতিমধ্যেই দু'দুবার আক্রান্ত হয়েছেন তিনি), মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে গ্রীসের জড়িয়ে পড়ার কথা, সম্ভবত রুমানিয়ার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক তোলপাড়ের কথা, ভয়ঙ্কর এক দুর্ভিক্ষের ছবি, রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র প্রয়োগের ইঙ্গিত, ইরান-ইরাক সংঘর্ষের অবসান ঘটার ইঙ্গিত। আমরা দেখেছি, ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার কথা বলেছেন নস্ত্রাদামু। কয়েকটি চতুষ্পদীতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে—যুদ্ধ শুরু হতে পারে ১৯৯৩,

১৯৯৫ অথবা ১৯৯৬ সালে।

মনস্তাপেও জোড়া লাগে না ফাটা ডিমে। হায় সুন্দরী বসুন্ধরা, অসীম ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকেই খাবে তুমি? আমি যত দূরেই যাই, সেই ছবি নিয়ত আমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।

১৫
ভারত আমার ভারতবর্ষ

কৌতূহলটা একান্তই স্বাভাবিক—আমাদের এই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কী বলে গেছেন নস্ত্রাদামু? পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে এতসব অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে মানুষটি, তিনি কি কিছুই বলে যাননি ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে?

এতক্ষণের আলোচনায় ভারত সম্বন্ধে মাত্র একটি চতুষ্পদীরই দেখা পেয়েছি আমরা, যে চতুষ্পদীর মধ্যে হয়ত সুপ্ত রয়ে গেছে এ-দেশের তিন গান্ধীর ছবি: ইন্দিরা, রাজীব, সঞ্জয়। এ প্রসঙ্গে আবারও জানিয়ে রাখি—এ চতুষ্পদীর ব্যাখ্যায় এরিকা শিথ্যাম্ কিন্তু ভারতের গান্ধী পরিবারের কোন উল্লেখ করেননি, ব্যাখ্যা করেছেন আমেরিকার কেনেডি পরিবারকে ধরে। গান্ধী পরিবার সংক্রান্ত ব্যাখ্যাটুকু একান্তভাবেই বর্তমান সংকলকের। আর একটি চতুষ্পদীতেও ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতা হারানো এবং আবার ক্ষমতায় ফিরে আসার ইঙ্গিত থেকে থাকতে পারে।

গান্ধী পরিবারের কথা ভাবতে পারেননি এরিকা শিথ্যাম্, কারণ তিনি বিশ্বাস করেন মিশেল নস্ত্রাদামুর কোন চতুষ্পদীতেই ভারতবর্ষের কোন ছায়া পড়েনি। তাঁর মতে, যে-কোন কারণেই হোক ভারতবর্ষের কথা একেবারেই এড়িয়ে গেছেন নস্ত্রাদামু, তাঁর গণনায় কোন স্থান পায়নি এ-দেশ। দুটো চতুষ্পদী প্রসঙ্গে একথা বলেছেন এরিকা শিথ্যাম্। চতুষ্পদী দুটো এ-রকম:

নিজের শত্রুদের তাড়া করতে উদ্‌গ্রীব জনৈক রাজা প্রবেশ করবেন
ব্যূহভেদ করে। দ্রুত পদক্ষেপে এত কাছ থেকে তারা তাড়া করবে
যে যুদ্ধ সংঘটিত হবে গঙ্গাঁর(Ganges) কাছাকাছি।
(চতুর্থ শতক, ৫১-তম চতুষ্পদী)

এখানে গ্যাঞ্জেস বা গঙ্গার উল্লেখ রয়েছে। গোটা চতুষ্পদীটার অর্থ **কী** দাঁড়াবে, বলা দুষ্কর। কিন্তু এরিকা শিথ্যামের মতে নস্ত্রাদামু সম্ভবত মঁপেলিয়ের কাছাকাছি অবস্থিত গ্যাঞ্জেস নামক একটা ছোট শহরের কথাই বলতে চেয়েছেন এখানে।

আর সপ্তম শতকের ৯-নং চতুষ্পদীতে নস্ত্রাদামু লিখছেন :

তার মহান প্রভুর (বা পতির) অনুপস্থিতিতে নারীটিকে প্রেমের জন্য চাইবেন ভাইসরয়। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও দুর্দশা এবং প্রেম —বার (Bar)-এর মহান রাজার হাতে।

ভাইসরয় শব্দটার উল্লেখে মনে পড়লেও পড়তে পারে ভারতবর্ষের কথা। কিন্তু এরিকা শিথ্যাম্ এ চতুষ্পদীর ব্যাখ্যা করেছেন ফ্রান্সকে ধরেই।

অর্থাৎ এরিকা শিথ্যামের পথে এগোলে নস্ত্রাদামুর লেখার মধ্যে ভারতবর্ষের কোন ছবি খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাহলে? উপায় একটাই—নস্ত্রাদামুর ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা। হ্যাঁ, অন্যভাবে ব্যাখ্যা করাই যায়, কারণ ঐ হেঁয়ালীভরা ভাষার গভীরে ঠিক কোন্ অর্থটি লুকিয়ে আছে, সে সম্বন্ধে গ্যারান্টি দিয়ে শেষ কথা বলা দুষ্কর। এ-রকম একটা ব্যাখ্যার দিকেই এগিয়েছেন ব্যাঙ্গালোরের জি. এস. হিরন্যাপ্পা। ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে নস্ত্রাদামুর ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তিতে লেখা তাঁর 'হিন্দু ডেস্টিনি ইন নস্ত্রাদামু' বইটি। আমেরিকার ডঃ জন হোগ-এর 'নস্ত্রাদামু অ্যাণ্ড দ্য মিলেনিয়াম' গ্রন্থের ব্যাখ্যাতেও ভারতের প্রসঙ্গ এসেছে। এ-রকম বিভিন্ন জনেরব্যাখ্যা থেকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করা যাক।

প্রথম শতকের ৫০-তম চতুষ্পদী :

তিনটি জলের লক্ষণবিশিষ্ট অঞ্চল থেকে জন্ম নেবে এমন একজন মানুষ যার পুণ্যদিন হবে বৃহস্পতিবার। তার খ্যাতি, প্রশংসা, শাসন ও ক্ষমতা বেড়ে উঠবে স্থল ও আকাশপথে, সমস্যা ডেকে আনবে প্রাচ্য ভূখণ্ডে।

এখানে 'ট্রিগার ওয়ার্ড' দুটো—তিনটি জল আর বৃহস্পতিবার। ভারতের তিন দিকে তিন সমুদ্র। আর ভারতবর্ষের হিন্দুদের পুণ্যদিন বৃহস্পতিবার। আমরা জানি খ্রীষ্টানদের পুণ্যদিন রবিবার, ইহুদীদের শনিবার আর মুসলিমদের শুক্রবার। অর্থাৎ ইঙ্গিতটা হিন্দুদের দিকেই এবং সেই সূত্রে মূলত ভারতের দিকে। ভারতবর্ষে জন্ম নেবে এক বিরাট নেতা, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে তার নাম, বেড়ে উঠবে তার ক্ষমতা। ভারতের কোন নেতা এতটা ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠলে প্রাচ্যের কয়েকটি দেশে, অন্তত: ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোয়, কিছুটা প্রতিক্রিয়া ঘটতে বাধ্য।

বৃহস্পতিবারের উল্লেখ আছে আর-একটি চতুষ্পদীতেও :

> **যখন তারা বৃহস্পতিবারে উপাসনা শুরু করবে তখন মাটি আর বাতাস হিমায়িত করবে প্রচুর জলকে। যে আসবে সে কখনোই তার অল্প কয়েকজন সহযোগীর মতো উজ্জ্বল হবে না, যে সহযোগীরা আসবে তাকে সম্মান জানাতে।**
>
> **(দশম শতক, ৭১-তম চতুষ্পদী)**

এখানেও বৃহস্পতিবার এবং উপাসনা। ইঙ্গিতটা যেন হিন্দুধর্মের দিকেই। আর সেইসঙ্গেই বিশেষ কোন একজনের অভ্যুদয়ের ইশারা।

কে সেই নেতা? এঁরা বলছেন—তাঁর নাম হবে 'চাইরেন' বা চাইরেঁ (Chyren)। হ্যাঁ, প্রফেসিজ-এর পৃষ্ঠায় কয়েকবার এই 'চাইরেন' বা 'শাইরেন'-এর উল্লেখ খুঁজে পাই আমরা।

> **পঞ্চনদীর দ্বীপের মধ্যে মহান চাইরেন সেলিন (Chyren Sclin)-এর বেড়ে ওঠা। বাতাসের কুয়াশা চিরে, একজনের ক্রোধ। ছয়জন পলাতক, শনের গোছায় লুক্কায়িত।**
>
> **(ষষ্ঠ শতক, ২৭-তম চতুষ্পদী)**

পঞ্চনদীর দ্বীপের মধ্যে বেড়ে উঠবে সেই অজানা চাইরেন সেলিন। পঞ্চ নদীর দ্বীপ বলতে একটা জায়গায় ফুটে ওঠে চোখের সামনে: পাঞ্জাব। পাঞ্জাব থেকেই কি উঠে আসবে সেই নেতা?

রহস্যময় চাইরেনকে আবার খুঁজে পাচ্ছি ষষ্ঠ শতকের ৭০-তম ভবিষৎকথনে :

“প্লাস আউল্ত্র”-এর (Plus Oultre) পর পৃথিবীর সর্বেসর্বা হয়ে উঠবে মহান চাইরেন—ভালবাসা পাবে, ভয় পাবে অনেকে এবং কেউ কেউ হবে আতঙ্কিত। তার খ্যাতি এবং প্রশংসা আকাশ ছাপিয়ে যাবে এবং বিজয়ী খেতাবের একমাত্র অধিকারী হিসেবে দারুণ তৃপ্তি পাবে সে।

এই চাইরেন যদি সত্যিই ভারতবর্ষের মানুষ হয়, তাহলে গর্বিত হওয়ার যথেষ্টই কারণ আছে ভারতবাসীর। সারা দুনিয়ার প্রধান হয়ে উঠবে সে, অধিকারী হবে বিপুল খ্যাতি আর প্রশংসার, আর তার সূত্রে ভারতও নিশ্চয়ই হয়ে উঠবে পৃথিবীর প্রধান শক্তি। হ্যাঁ, মনে রাখা দরকার, যদি ঐ চাইরেন সত্যিই ভারতবর্ষের মানুষ হয়, তবেই।
আবার সেই অজানা চাইরেন :

বৈবাহিক চুক্তির আবরণে একটি মহৎ কাজ সম্পন্ন করবে চাইরেন সেলিন। যাত্রাপথে পুনরুদ্ধার করা হবে সেণ্ট কুয়েন্তিন এবং অ্যারাস। দ্বিতীয় কসাইয়ের আসন দখল করবে স্পেনীয় মানুষটি।
(অষ্টম শতক, ৫৪-তম চুতুষ্পদী)

সেণ্ট কুয়েন্তিন, অ্যারাস, স্পেনীয় মানুষ—এ-সবের মধ্যে ভারতবর্ষের ঠিকানা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তবে, দেখছি, কোন-একটা মহৎ কাজ সম্পন্ন করবে সেই চাইরেন সেলিন।

হয়ত এই এখনও-অজানা চাইরেন সেলিনই হয়ে উঠবে বিপন্ন ধরিত্রীর পরিত্রাতা। আজকের যুদ্ধ-রক্ত-স্বার্থপরতায় দীর্ন পৃথিবীর যে এখনই একজন পরিত্রাতা দরকার, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যদি সেই পরিত্রাতা ভারতবর্ষের মানুষ হয়, তার হাত ধরে ভারত যদি আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারে, তাহলে—অভিনন্দন, নস্ত্রাদামু! কিন্তু,চাইরেন সেলিন কি কোন ভারতীয়ের, নির্দিষ্টভাবে কোন হিন্দুর, নাম হতে পারে? চাইরেন না হয়ে উচ্চারণটা যদি শাইরেন হয়, কিংবা চাইরেঁ বা শাইরেঁ সেল্যাঁ, অথবা চিরেন বা শিরেন? নাকি হিটলার যেমন হিসটার হয়েছে, নেপোলিয়ঁ হয়েছে প্য জে লরঁ, তেমনিভাবে এই চাইরেনও সেই ভাবী পারিত্রাতার প্রকৃত নামের খুব কাছাকাছি কোন শব্দ?

নস্ত্রাদামুর ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভারত প্রসঙ্গে আরও কিছু বক্তব্য পেশ করেছেন হিরন্যাপ্পা। বলেছেন, ৯০-এর দশকের গোড়ার দিকেই সাম্যবাদী ধ্যানধারণার আওতা থেকে বেরিয়ে আসবে রাশিয়া, গ্রহণ করবে ভারতীয় দর্শনের আদর্শ। আরও বলেছেন, মিত্রশক্তি হিসেবে ভারতের পাশে এসে দাঁড়াবে রাশিয়া আর আমেরিকা, তাদের পাশে পেয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে এক শ্রেষ্ঠ শক্তি হয়ে উঠবে ভারত। তাঁর হিসাব মতো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল ১৯৯৯ থেকে ২০০৬ সাল এবং সে যুদ্ধে পরমাণু অস্ত্রের প্রয়োগ ঘটাবে চীন।

চতুর্থ শতকের ১৪-তম কথনেও কি ভারতের প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি?

নেতার আকস্মিক মৃত্যুতে ঘটবে পরিবর্তন, ক্ষমতায় আসবে অন্য
আরেকজন। শীঘ্রই কিন্তু বড় দেরিতে সে বসবে উচ্চ আসনে,
অল্প বয়সেই। স্থল এবং আকাশ পথে তাকে ভয় পেতে হবে।

এরিকা শিথ্যাম্ ভাবতে চেয়েছে—এ চতুষ্পদীতেও হয়ত ইঙ্গিতটা আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডির দিকেই। বর্ষীয়ান আইজেন হাওয়ারের পর ক্ষমতায় এসেছিলেন অপেক্ষাকৃত তরুণ কেনেডি। আবার, অন্যচোখে দেখতে চাইলে এর মধ্যে এই ভারতের একটা অস্পষ্ট ছবিও ফুটে উঠতে পারে। ১৯৮৪ সালে আকস্মিকভাবেই নিহত হন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। নেত্রী এবং জন্মদাত্রীর অনুপস্থিতিতে ক্ষমতায় আসেন রাজীব গান্ধী। হ্যাঁ, অল্প বয়সেই। কারণ তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৪০ বছর। শীঘ্রই ক্ষমতায় এসেছিলেন রাজীব, কারণ ১৯৮০ সালে রাজনীতিতে যোগ দিয়ে চার বছরের মধ্যেই তিনি পৌঁছতে পেরেছিলেন দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতায়। আবার দেরিতেও বটে, কেননা পাইলটের পেশায় থাকার ফলে রাজনীতির জগতে আসতেই তো অনেক দেরি হয়েছিল তাঁর।

কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে ভারতে মুসলিম শাসনের অবসান, তাদের বিরুদ্ধে এ-দেশের বিভিন্ন জাতির বিদ্রোহ, ঔরংঙ্গজেবের কারাগার থেকে শিবাজীর কৌশলে পালানো, শিখদের উত্থান, ইংরেজের ভারত দখল ও ভারত ত্যাগ—এ-সব ঘটনার ইঙ্গিতও খুঁজে পাওয়া যায় নস্ত্রাদামুর বিভিন্ন চতুষ্পদীতে।

এবার এমন একটা চতুষ্পদী তুলে ধরা যাক পাঠকের সামনে যেটার কোন ব্যাখ্যা হাজির করতে পারেননি এরিকা শিথ্যাম্। এ চতুষ্পদীর সঙ্গে

ভারতবর্ষের সম্পর্ক থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। তীক্ষ্ণধী পাঠক হয়ত ভেদ করতে পারবেন অন্তর্নিহিত রহস্যজাল।

ধনুকের দ্বারা প্রতিহত, জ্বলন্ত পিচ ও আগুন, মাঝরাতে শোনা যাবে আর্তনাদ ও চিৎকার। তারা ভেতরে ঢুকবে ভেঙে-পড়া(বা দুর্বল) নিরাপত্তা ভেদ করে। গোপন পথে পলায়ন করবে বিশ্বাসঘাতকরা।

(দ্বিতীয় শতক, ৭৭-তম চতুষ্পদী)

ব্যাখ্যা জানা নেই। তবে, ১৯৯১ সালের ২১শে মে রাত দশটা কুড়ি মিনিটে বোমা বিস্ফোরণে রাজীব গান্ধীর নিহত হওয়ার একটা ইঙ্গিত যেন চোখে পড়ে।

উত্তরাধিকারীটি বদলা নেবে তার ভ্রাতার এবং প্রতিশোধের পরিবেশেই দখল করবে রাজত্ব। নিহত হবে সে, নিন্দনীয় মৃতের প্রতিবন্ধক, তার রক্ত। দীর্ঘদিন ধরে ফ্রান্সকে অনুমোদন করবে ব্রিটেন।

(দশম শতক, ২৬-তম চতুষ্পদী)

শেষ লাইনটা বাদ দিলে বাকি অংশটা থেকে রাজীব গান্ধী, সঞ্জয় গান্ধী এবং রাজীবের হত্যাকারীর একটা ছবি যেন সামনে আসতে চায়।

এবার যে চতুষ্পদীটি উদ্বৃত করছি, সেটিকে নিজস্ব ভাবনা অনুযায়ী-ব্যাখ্যা করেছেন এরিকা শিথ্যাম্। আমাদের পাঠক অন্য কোন আলোয় হয়ত খুঁজে পেতে পারেন এই ভারতের ঠিকানাও :

চতুর্থ স্তম্ভে, যেটি তারা উৎসর্গ করেছে শনির নামে সেখানে ভূমিকম্প এবং রক্তের দ্বারা ছিন্নভিন্ন। শনির প্রাসাদের নিচে পাওয়া যাবে একটি অস্থিকলস। সোনা নিয়ে চলে যাবে সেপিও এবং তারপর তা পুনরুদ্ধার করা হবে।

(অষ্টম শতক, ২৯-তম চতুষ্পদী)

কোন সঙ্কেত কি পাচ্ছেন, পাঠক ?

এবার আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী, যেটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অসহায় এরিকা শিথ্যাম্‌কে বলতে হয়েছে—না, এর অর্থ উদ্ধার করার সাধ্য আমার নেই।

প্রতিবছর আরও গুরুত্বপূর্ণ(বা বিশিষ্ট) হয়ে উঠবে সাম্রাজ্যটি। একজন এসে অন্য সকলের ওপর (ক্ষমতা) বিস্তার করবে। কিন্তু তার রাজত্ব এবং জীবন হবে স্বল্পমেয়াদী। দু-বছরের মধ্যেই সে নিজেকে নিজের জাহাজে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

(দশম শতক, ৩২-তম চতুষ্পদী)

একই প্রশ্ন আবার: কোন দিকচিহ্ন কি খুঁজে পাচ্ছেন, পাঠক?

দিনের বেলায় বজ্রের আঘাতে ভূপতিত হবে মহান মানুষটি। ক্ষতিকর কাজ, যার ভবিষ্যদ্বাণী আগেই করবে একটি আবেদনপত্রের বাহক। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আর-একজন নিহত হবে রাত্রিবেলায়। রাইম্‌স্‌, লণ্ডনে সংঘাত, টাস্‌ক্যানিতে মহামারী।

(প্রথম শতক, ২৬-তম চতুষ্পদী)

এ চতুষ্পদীর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এরিকা শিথ্যাম্‌ যথা নিয়মে আমেরিকার কেনেডি পরিবারের ঘটনাকেই সামনে আনতে চেয়েছেন—জন কেনেডি নিহত হয়েছিলেন প্রকাশ্য দিবালোকে আর রবার্ট কেনেডি রাত্রে (ঠিক রাতে অবশ্য নয়, একেবারে ভোর নাগাদ)। আমাদের পাঠক কিন্তু চেষ্টা করলে এরিকার পথ ছেড়ে একটু অন্য পথেও হাঁটতে পারেন। প্রথমজন নিহত দিনের বেলায়, দ্বিতীয়জন রাতে। ১৯৮৪ সালে ৩১ অক্টোবর আততায়ীর গুলি যখন ঝাঁঝরা করে দেয় ইন্দিরা গান্ধীকে, সূর্য তখন মাঝ-আকাশেও যায়নি। সকাল। তরতাজা সকাল। আর দ্বিতীয়জন, রাজীব গান্ধী, শ্রীপেরাম্পুদুর, ২১মে ১৯৯১, প্রচণ্ড শক্তিশালী বোমার বিস্ফোরণ—ঘড়ির কাঁটায় তখন কিসের ইশারা? রাত দশটা বেজে কুড়ি মিনিট। রাত। ঝিম্‌ধরা রাত। একজন দিনের আলোয়, অন্যজন রাতের আঁধারে। দুজনেরই জীবনের ঝুঁকি ছিল, সম্ভাব্য বিপদের সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেছিলেন অনেকে। ভবিষ্যদ্বাণী তো করা হয়েছিল। অন্যান্য দেশের উল্লেখের মধ্যে হয়ত লুকিয়ে আছে এই দুটি হত্যাকাণ্ডের পর আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার কথাই।

ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে মিশেল দ্য নস্ত্রাদামুর ভবিষ্যৎদ্বাণীর আলোচনায় আপাতত এটুকুই শুধু তুলে ধরতে পারি আমরা। গভীর গবেষণা এবং পায়ে-পায়ে এগিয়ে-আসা ভবিষ্যৎ হয়ত আরও অনেক দিকচিহ্ন ফুটিয়ে তুলবে স্পষ্ট করে।

আমরা কি আলো হাতে খুঁজতে বেরোবো সেই অজানা চাইরেন সেলিনকে? সেই মানুষ কি চেয়ে আছেন আকাশ ভরে? নিশিদিন অনিমেষে দেখছেন আমাদের? সেই মানুষ চোখ মেলুক ভারতবর্ষের মাটিতে, মোদের ব্যথার পূজা হোক সমাপন।

১৬

রাতের সব তারাই আছে

অনেক কথাই বলা হল। গল্প এখন নটেগাছটি মুড়োনোর দিকে। তা মুড়োক। কিন্তু মুড়োনোর আগে আরও কিছু না-নাম-জানা পাতানাতা কুড়িয়ে-বাড়িয়ে মিলে আখেরে লাভ বৈ কি লোকসান নেই। দিনের প্রখর আলোয় যে-সব তারারা চোখের বাইরে, রাত নামলে সেই তারার দলই উজ্জ্বল অতিথি। দিনের আলোতেই আকাশ জুড়ে তো ছড়িয়ে থাকেই তারা, শুধু দেখা যায় না, খোঁজ মেলে না।

এ পরিচ্ছেদে এমন কিছু ভবিষ্যদ্বাণীকে ছাপার হরফে সাজিয়ে দেওয়া যাক, যেগুলোর কোন সমাধান খুঁজে পায়নি এরিকা শিথ্যাম্। কোথাও কোথাও একটু-আধটু সঙ্কেত হয়ত পেয়েছেন, কিন্তু জট ছাড়াতে পারেননি মূল রহস্যের। ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পাঠকের সামনে রাখছি আমরা। চেষ্টা করে দেখুন জট ছাড়ানো যায় কিনা। কোন জটিল বাধার সমাধান করার মতোই স্বাদু এই চেষ্টাটা।

শুরু করা যাক প্রথম শতক থেকেই।

মহান রাজা যোগ দেবেন দুজন রাজার সঙ্গে, আবদ্ধ হবেন বন্ধুত্বের বন্ধনে। রাজপরিবারটির বরাতে কত না দুঃখ। নরবোন-এর আশেপাশে, শিশুগুলির কি দুঃখ।

(প্রথম শতক, ৯৯-তম চতুষ্পদী)

এবার দ্বিতীয় শতক :

আন্দ্রোজিন(Androgyn)-এর জন্মে ডুকরে কেঁদে উঠবে স্বর্গ; স্বর্গের কাছে ছিটকে পড়বে মানুষের রক্ত। এই মৃত্যুর ফলে মহান দেশটির পুনরুজ্জীবন ঘটতে অনেক দেরি হয়ে যাবে; প্রত্যাশিত সাহায্য এসে পৌঁছবে শীঘ্রই অথচ বড়ই দেরিতে।

(দ্বিতীয় শতক, ৪৫-তম চতুষ্পদী)

তৃতীয়, চতুর্থ আর পঞ্চম শতকেও কিছু কিছু চতুষ্পদীর কোন সমাধান খুঁজে পায়নি এরিকা শিথ্যাম্। সেগুলো পেরিয়ে আমরা চোখ রাখি ষষ্ঠ শতকে।

কুৎসাকারী কুৎসা রটনা করবে কনিষ্ঠের নামে, যখন সাধিত হবে ব্যাপক সামরিক কাজকর্ম। জ্যেষ্ঠজনের সম্বন্ধে কুৎসা রটবে খুবই কম। শীঘ্রই দেশ জুড়ে দেখা দেবে কড়র রাজনৈতিক কার্যকলাপ।

(ষষ্ঠ শতক, ৯৫-তম চতুষ্পদী)

সপ্তম ডিঙ্গিয়ে অষ্টমে পা।

দুই নদীর মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থায় নিজেকে দেখবে সে, পার হওয়ার জন্য জোড়া হবে অনেক পিপে আর জালা। ভাঙা হবে আটটি সেতু, তাদের সর্দারি অনেকবার দ্রুত কাজ সারবে। ছুরি দিয়ে কাটা হবে শিশুদের গলা।

(অষ্টম শতক, ৫৬-তম চুতুষ্পদী)

বড় বেশী ধোঁয়াশা। বাধ্য হয়েই হার মানতে হয়েছে এরিকা শিথ্যাম্‌কে। তবু চেষ্টাপাতি করে কোন একটা গিঁটও যদি খোলা যায়-মিলে যেতেও পারে আলোর ঠিকানা।

অষ্টম শতকেই আবার :

কনিষ্ঠ জনের পাশে নেমে আসবে বৃদ্ধ দেবদূতটি এবং শেষ পর্যন্ত তাকে ছাপিয়ে উঠবে। দশ বছর পরে পতন ঘটবে জ্যেষ্ঠেরও, তিন, দুই, এক, অষ্টম দেবদূত।

(অষ্টম শতক, ৬৯-তম চতুষ্পদী)

ঐ অষ্টম শতকেই দেখছি :

এক বর্বর সৈনিক অন্যায়ভাবে আঘাত করবে রাজাকে, মৃত্যু তখন আর খুব দূরে নয়। এ কাজের পিছনে কারণ হিসেবে কাজ করবে লোভীরাই, গভীর অনুশোচনায় দগ্ধ হবে চক্রান্তকারী এবং সমগ্র রাজ্য।

(অষ্টম শতক, ৭৩-তম চতুষ্পদী)

নবম শতকে যাওয়ার আগে অষ্টম শতকেরই আর-একটা হেঁয়ালীর দিকে চোখ রাখা যাক :

যে তার পিতাকে হারাবে তরবারির আঘাতে, যার জন্ম হবে সন্ন্যাসিনীদের এক মঠে, সে এই গর্গনের রক্তের ওপর প্রকাশিত হবে নতুন করে। এক অজানা দেশে নির্বাক থাকার জন্য সবকিছু করবে সে, আর সে দগ্ধ করবে নিজেকে এবং নিজের সন্তানকে।

(অষ্টম শতক, ৭৯-তম চতুষ্পদী)

এখানে গর্গন শব্দের অর্থটাই শুধু জানিয়ে রাখা যায়। গর্গন হচ্ছে গ্রীক পুরানের দানবী। যে-কোন মানুষ তার দিকে তাকালে পাথরে পরিণত হত।

নবম শতক :

পরের বছর বন্যা, নিবার্চিত হবেন দুজন নেতা, প্রথমজন টিকে থাকতে পারবেন না। তাঁদের মধ্যে একজন আশ্রয় নেবে অপসৃয়মান ছায়াতে। প্রথমজনের দেখাশোনা করবে যে, সেই শিকারটি লুণ্ঠিত হয়ে যাবে।

(নবম শতক, ৪ নং চতুষ্পদী)

ব্যাপারটা যেন বাসরঘরে জামাই-ঠকানো প্রশ্নেরই রকমফের কিন্তু চারশ বছর আগের সেই রহস্যময় মানুষ মিশেল দ্য নস্ত্রাদামুর বচনবৃত্তান্তের সুলুক সন্ধান করতে গিয়ে আমরা বারবার দেখেছি—কথাগুলো জামাই-ঠকানো নয়, দুনিয়া-কাঁপানো। কাজেই, ভাবুন পাঠক। ভবিষ্যতের পৃথিবীর কোন অজানা ঠিকানা হয়ত অপেক্ষা করছে আপনারই জন্যে।

জীবন্ত পৃষ্ঠাগুলিকে (অথবা বালক-ভৃত্যদের) দগ্ধ করার জন্য তিনটি চিমনিতে ছুঁড়ে দেবে তরুণ নিরো (Nero)। এ-সব কথা ঘটনা থেকে অনেক দূরে থাকবে যে, সে খুশি হবে। তার পরিবারের তিনজন গোপনে আক্রমণ করে হত্যা করবে তাকে।
(নবম শতক, ৫৩-তম চতুষ্পদী)

নবম শতকেই আবার ঐ নিরোর আর্বিভাব।

লোভী ও খুনে রাজার সঙ্গে, তৃণশয্যা থেকে উঠে আসবে নির্মম নিরো। দুই নদীর মাঝখানে, সৈন্য বাহিনী যখন বাঁদিকে, তাকে হত্যা করবে এক টাকমাথা যুবক।
(নবম শতক, ৭৬-তম চতুষ্পদী)

এবার শেষের কবিতা, শেষ শতক : দশম শতক।

খুন আর বিপুল ব্যভিচারের চিহ্নে চিহ্নিত সমগ্র মানবজাতির পরম শত্রুটি তার পূর্বপুরুষ, কাকা আর বাবাদের চেয়েও খারাপ হবে। ইস্পাত, আগুন আর জলে, খুনে ও নিষ্ঠুর।
(দশম শতক, ১০ নং চতুষ্পদী)

এবার একটু অন্য স্বাদ :

দ্বিতীয় এবং তৃতীয়জন সৃষ্টি করবে প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীত। তাঁদের গভীর সম্মান জানাবেন রাজা। মোটা এবং রোগার সাহায্যে,

এমনকি আধা-ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থায়, চরিত্র হনন করা হবে শুক্রের (অথবা সুন্দরী মহিলার) মিথ্যা বিবৃতি মারফৎ।

(দশম শতক, ২৮-তম চতুষ্পদী)

পরের ভবিষ্যদ্বাণীতে এক 'মালা-হাতে মহিলা'র উপস্থিতি।

বার্গোস শহরে, মালা-হাতে মহিলাটির কাছে,রাজদ্রোহের ব্যাপারে রায় দেবে তারা। ফর্মেডের মারফৎ লিওঁ-র প্রধান পুরোহিত, ভণ্ড তীর্থযাত্রী ও চোরদের দ্বারা সবই পণ্ড।

(দশম শতক, ৪৭-তম চতুষ্পদী)

পিতার সামনেই নিহত হবে তার সন্তান, পরে নিহত হবে পিতাও, নলখাগড়ার দড়ির ঘেরাটোপে। জেনেভার লোকেরা পীড়িত হবে, তাদের মাঝখানে মুণ্ডহীন মৃতদেহের মতো পড়ে থাকবে রাজা।

(দশম শতক, ৯২-তম চতুষ্পদী)

এবার শেষ একটা হেঁয়ালী সামনে রেখে এ পরিচ্ছেদের ইতি টানা যাক।

স্পেনের বুকে অভ্যুদয় ঘটবে এক শক্তিশালী রাজার, স্থল এবং সমুদ্র পথে দক্ষিণকে পদানত করবে সে। এই অশুভ কাজের ফলে আবার অবনতি ঘটবে অর্ধচন্দ্রের, শুক্রবারের লোকেদের দ্বারা অবনতি ঘটবে প্রান্তভাগগুলির (অথবা ডানাগুলির)।

(দশম শতক, ৯৫-তম চতুষ্পদী)

এই শেষ চতুষ্পদীটির একটা কাজ-চলা-গেছে ব্যাখ্যা অবশ্য হাজির করেছেন এরিকা শিথ্যাম্। স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ, ১৫৭১ সালের লেপান্তো-র যুদ্ধ—এ-সব উপাদানের মধ্যেই সমাধান খুঁজেছেন তিনি। কিন্তু, অন্য কোন ইঙ্গিতও থাকতে পারে এ চতুষ্পদীর। আমরা মনে রাখছি অর্ধচন্দ্র একটি মুসলিম প্রতীক আর মুসলিমদের উপাসনার দিন শুক্রবার।

মিশেল দ্য নস্ত্রাদামুর অচেনা ভাষাকে চিনতে পারছেন, পাঠক? খুঁজে পাচ্ছেন রাতের তারাদের? এমন কেন, এমন কেন ঘোর-নিশীথের পর্দা

ছড়ায়/কিছুই নয় ভেবেও দেখি রন্ধ্রপথে সাপের চলন।

১৭

ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে

অনেক পথ পার হয়ে, রাতের ছায়া মাড়িয়ে, বিজন বনভূমির নৈঃশব্দ্যে শরীরী চেতনাকে ডুবিয়ে আর পৃথিবীর অনন্ত আবর্তন অগণন সময়ের ফাঁকফোকরে চোখ মেলে রেখে ঘনিয়ে এলো ঘুমের ঘোর। গানের পালা সাঙ্গ হবার লগ্ন এখন জীবনের সীমানা ছুঁয়ে তিরতির করে কাঁপছে। ক্লান্ত ডানায় ঘুম খুঁজছে শ্রান্ত সে এক বুলবুলি।

১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দ।

মিশেল দ্য নস্ত্রাদামুর বয়স এখন ৬২ পেরিয়েছে, শরীরে নেমেছে বার্ধক্য, জরা। আর্থ্রাইটিস আর বাত চেপে বসেছে সমগ্র অস্তিত্বে। চিন্তা-ভাবনা এলোমেলো, দৃষ্টিশক্তি, দূর-সুদূর দর্শনের শক্তি ক্ষীয়মান। সম্মান, যশ, অর্থ—সমস্যা নেই কোন কিছুরই। দু'বছর আগে উইল করেছে মিশেল। সব থেকে বেশি অর্থ নির্দিষ্ট হয়েছে প্রিয় কন্যা মাদেলিনের জন্য—৬০০ ক্রাউন। অন্য দুই কন্যা অ্যানি আর ডায়না পেয়েছে ৫০০ ক্রাউন করে। সেজার, আঁদ্রে, চার্লস—তিন পুত্র পঁচিশ বছর বয়স হলে ১০০ ক্রাউন করে পাবে, এমন ব্যবস্থা হয়েছে। কিছু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ হয়েছে নানান সম্পত্তি। আর, শহরের তেরোজন ভিক্ষুকের জন্যও কিছু অর্থ মঞ্জুর করেছে মিশেল। নির্দেশ দিয়েছে নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধেও। এগুলো ছাড়াও, সেজার আর মাদেলিনের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ছোট-বড় আরও হরেক অধিকার।

'শ্যাভিনি ফিরলো?' মিশেলের গলায় বড় ক্লান্তি।

'না। সেজারও তো ফেরেনি এখনো।' মাদেলিন বসে আছে অসুস্থ বাবার পাশে।

জানলা দিয়ে ফ্রান্সকে দেখছে ফুরিয়ে-আসা রাজা। জীবনের আঁকে-বাঁকে এতদিন ছড়িয়ে ছিল কখনও যন্ত্রণা-রিক্ততা, আবার কোথাও-বা এক-আঁজলা আদর-মাখা ভুবনডাঙার মেঘলা আকাশ। আজ বেলা-শেষের গান, আজ ঘরে-ফেরার গান।

ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলো তখন সেজার আর শ্যাভিনি। সেজার হাত রাখলো বাবার হাতে, 'সব হয়ে গেছে বাবা!'

'হয়েছে? সত্যি! আহ্!' মিশেল নস্ত্রাদামুর স্বপ্নমেশা চোখের তারায় আজ আবার আলোর নাচন। এতোদিনে—এতোদিনে তাহলে সব কাজের পূর্ণচ্ছেদ!

প্রকাশিত হয়েছে 'প্রফেসিজ'!

মিশেলের জীবন-সাধনা 'প্রফেসিজ'-এর ছত্রে ছত্রে অনন্ত আয়ু নিয়ে বেঁচে থাকলো ষোড়শ শতাব্দীর এক মানুষ। ('প্রফেসিজ' পুর্ণাঙ্গ আকারে প্রকাশিত হয়েছিল এর দু'বছর পর, ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকাশ করেছিল শ্যাভিনি আর অ্যান্ নস্ত্রাদামু)।

'অ্যান্!'

দুর্বল কণ্ঠে তার বিগত একুশটা বর্ষা-বসন্তের সঙ্গীকে কাছে ডাকলো মিশেল। শয্যাপার্শ্বে এসে বসলো অ্যান্।

নির্নিমেষ দৃষ্টিতে অ্যানের দিকে তাকিয়ে থাকে মিশেল। অনেক কিছু বলার আছে ওর। বলার আছে—অ্যান্, সারাজীবনে আমি বোধ হয় তোমাকে ঠিক শান্তি দিতে পারিনি, অনেক কিছুই পাওনি তুমি। রাতে রাতে আমাকে সেই ছোট্ট চিলেকোঠায় টেনে নিয়ে গেছে অনাগত পৃথিবীর চৌম্বক-শক্তি। আমার উপায় ছিল না অ্যান্, আমি যে ভবিষ্যতের জন্যেই জন্মেছিলুম, বর্তমান শুধু বেঁধে রেখেছিল আমার শরীরটাকে, শরীরী সত্তাটাকে। কিন্তু আমার মস্তিষ্কে, চেতনায় ছুটে বেড়িয়েছে ধরিত্রীর আগামী ঠিকানা, দু'চোখের গভীরে অবিরাম ভেসেছে এক জলযান—এক অলৌকিক জলযান। আমি এক নীলকণ্ঠ পাখি খুঁজতে চেয়েছি, অতীব মায়াময় কোন বাজনার তালে তালে পা ফেলতে চেয়েছি অন্য সে এক পৃথিবীর শরীরে। আর সেই পৃথিবীতে কতশত রঙ—হলুদ, সবুজ, নীল, গোলাপী, লাল, পান্না-চুনি-মুক্তো-হীরের মতো—খুঁজতে গিয়ে আমি শুধু অ্যান্ দেখে ফেলেছি অমাবস্যার মতো চাঁদ-খাওয়া রাতের মতো ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ এক পর্দা। হাওয়ায় হাওয়ায় দুলছে পর্দাখানা, আমার সাধের ফ্রান্স, পৃথিবী... অ্যান্, আমি এ দেখতে চাইনি। কারা যেন সব বাতি চুরি করে নিয়ে মোড়ে মোড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে মুঠো মুঠো অন্ধকার; তুমি অ্যান্, আমাকে ভুল বুঝো না, এ আমি দেখতে চাইনি।

কিন্তু এ-সব কথা হয় না। মিশেল শুধু বলে, 'আমার বই আজ সম্পূর্ণ হয়ে বেরিয়েছে অ্যান্। আমার কাজ এবার শেষ।'

হয়তো সেদিন ফ্রান্সের মাটি অ্যান্ নস্ত্রাদামুর চোখের জলে ভিজে কুঁকড়ে গিয়েছিল লজ্জাবতী লতার মতো।

পর পর ক'দিন খুব ব্যস্ত রইলো শ্যাভিনি। উনিশ বছরের তরুণ সেজারেরও বিশ্রাম নেই। ব্যগ্র, কৌতূহলী মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে যাচ্ছে 'প্রফেসিজ' ('হাতে হাতে কথাটা সর্বাংশে সত্য নয়। বই কেনা তখন ছিলো অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার। শুধু অভিজাত বংশীয়রাই কিনতে পারতো বই। সাধারণ মানুষ জানতে পারতো মুখে মুখে)। নানান বিচিত্র আলোচনা, ভবিষ্যৎ-চিন্তায় আচ্ছন্ন হচ্ছে ফ্রান্স।

আচ্ছন্ন হয় ছোট্ট ডায়নাও। চারিদিকে বাবার এতো প্রশংসা, সবাই আঙুল দেখিয়ে বলে, 'ঐ দ্যাখো মিশেল নস্ত্রাদামুর মেয়ে যাচ্ছে।' কী করেছে বাবা? আর, কী হয়েছে বাবার? মা একলা ঘরে কাঁদে, দাদা দিদিরা খেলতে চায় না। বাবা প্রায় সারাক্ষণ শুয়ে থাকে বিছানায়।

অস্থির হয়ে ওঠে বালিকা। তার সঙ্গে খেলতে আসে শ্যাভিনি।

[নস্ত্রাদামুর কথা বলতে গিয়ে শ্যাভিনি আর সেজারের কথা বারবার এসে পড়ে। পরবর্তীকালে শ্যাভিনি বই লিখেছে নস্ত্রাদামু বিষয়ে, সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছে নস্ত্রাদামুর জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত কিছু লেখা। সেজার লিখেছে বই: Histoire de Provence, প্রভাঁসের ইতিহাস। মিশেল নস্ত্রাদামু প্রসঙ্গে নানান তথ্য মেলে এই বইতে। তা ছাড়াও, সেজার ছিল কবি এবং দক্ষ চিত্রকর।]

১৫৬৬-র জুন মাসের শেষদিক। সালোঁর বাড়িতে প্রাণস্পন্দন বড় ক্ষীণ। আর্থ্রাইটিস আর বাতের সঙ্গে এবার হানা দিয়েছে প্রবল শোথরোগ। চোখে চোখে কথা হয় সেজার আর শ্যাভিনির—আর নয়।

আঁদ্রে, চার্লস, মাদেলিন, অ্যানি চাপাগলায় কথা বলে। অবুঝ ডায়না ঘুরঘুর করে বাবার ধারে-কাছে। অ্যান্ ছায়াছোঁয়া চোখে দেখে তার একুশ বছরের ঘুম-অঘুমের সঙ্গীকে। বসন্ত পেরিয়ে তার গ্রীষ্মের সঙ্গী, তার অপার-রহস্যে-ঢাকা সঙ্গী।

এবং, সবার থেকে বেশি করে বুঝতে পারে স্বয়ং মিশেল। নিজে সে দক্ষ চিকিৎসক। বহু মানুষের জীবন-মৃত্যুর তীব্র লড়াই-এর অংশীদার। ও জানে, কোন্ সীমারেখায় পৌঁছে জীবন সরে দাঁড়ায়, কখন সে পথ ছেড়ে দেয় মৃত্যুকে, এবং লাফিয়ে আসে মৃত্যু। নিজের সীমারেখা চিনতেও ভুল হয়নি ওর।

দেখতে আসে নানাজন। মিশেল হাসতে চেষ্টা করে, দুর্বল কণ্ঠে কথা

বলে জীবনের অস্তিত্ব জানান দেয়।

অনেক বাঁক-মোড়-ফের টলে টলে পার হয়ে, অতিক্রান্ত হলো জুন মাস।

১ জুলাই। আজ নতুন মাসের পদধ্বনি!

সেজারকে ডাকলো মিশেল, 'সেজার, একবার গির্জার ফাদারকে ডেকে নিয়ে এসো।'

'কেন' প্রশ্নটা করতে গিয়েও থমকে যায় সেজার। ভবিষ্যদ্বক্তাদের রাজা দেখতে পেয়েছেন নিজের ভবিষ্যৎ। এখন ফাদারের কাছে দিয়ে যাবেন অন্তিম স্বীকারোক্তি : কন্‌ফেসন্‌।

স্থানীয় ফ্রান্সসিস্‌কান্‌ গির্জার ফাদারকে ডেকে নিয়ে এসেছিল সেজার। ফাদারের কাছে কি স্বীকারোক্তি দিয়েছিল মিশেল, তা আজ জানার কোন উপায় নেই। মানুষের ঐ অন্তিম স্বীকারোক্তি বড় গোপন, একান্ত বিষয়। ফাদাররা তা জানান না কাউকেই। শেষ আলো নিভে গেল পলাতকা নীলিমার পারে! বাতাসের মতন অবাধ/রয়েছে জীবন,/নক্ষত্রের তলে শুয়ে ঘুমায়েছে মন/একদিন।

রাত্রি।

সালোঁর বাড়িতে সেদিন কারো চোখে নামেনি ঘুম। নির্বাক, অচঞ্চল শুয়ে আছে নস্ত্রাদামু। ঘরে এলো শ্যাভিনি।

'শুভরাত্রি, মঁসিয়।'

মিশেলের ঠোঁটের কোণে হাসি ভাঙলো একটুকরো। শুভরাত্রি! আজ যে শেষরাত্রি!

ধীরকণ্ঠে জীবনের শেষ কথা, এবং শেষতম ভবিষ্যদ্বাণী করলো মিশেল দ্য নস্ত্রাদামু, 'তোমাদের আগামী সব রাত শুভ হোক, শ্যাভিনি। আমার আজ শেষ রাত। আমার আর দেখা হবে না আগামী ভোরের সূর্যোদয়।'

একমাত্র ডায়না বাদে সালোঁর বাড়িতে সেদিন বিনিদ্র রাত কাটিয়েছে সাতজন মানুষ।

এবং ২ জুলাইয়ের সূর্যোদয়ের আগে তারা আবিষ্কার করেছে—বিছানায় ওঠার বেঞ্চটার ওপরে ঘুমিয়ে আছে ভবিষ্যদ্বক্তাদের রাজা। সীমাহীন ঘুমের জগতে পা দিয়ে, শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে গেছে রাজা। তার অন্তিম ভবিষ্যদ্বাণী সফল। জীবনের কোন বালুতটে, কোন শ্যাওলা-জাগা ঘাটে, সূর্য তার ওঠেনি আর কখনও।

তখন বুঝি কোথাও, কোন অজানা অরণ্যের শতাব্দীর শবদেহে শ্মশানের ভস্মবহ্নি জ্বলে। অতীতের হিমগর্ভ কবরের মাঝে শুয়ে থাকে এক রাজত্বহীন রাজা : মিশেল দ্য নস্ত্রাদামু।

১৮

বন্ধু, কুয়াশা সাবধান

বন্ধু, কুয়াশা সাবধান এই সূর্যোদয়ের ভোরে, পথ হারিও না আলোর আশায় তুমি একা ভুল করে।

এই শেষ পরিচ্ছেদে দুটো প্রসঙ্গকে ছুঁয়ে যাওয়া দরকার। এক, ভবিষ্যতের ছবিগুলো কিভাবে পেতেন নস্ত্রাদামু; দুই, ভবিষ্যদ্বাণীর অপব্যবহার। শুরু করা যাক প্রথমটা দিয়েই।

এরিকা শিথ্যাম্ চাররকম পন্থার কথা বলেছে—ভবিষ্যৎদর্শন (vision), প্রত্যাদেশ (revelation), আবিষ্ট সমাধি (trance), আর স্বপ্ন (dream)। জাগ্রত অবস্থায় মনের মধ্যে অথবা মনের বাইরে একটা-কিছু দেখাকে ভবিষ্যৎদর্শন বলা যায়। হতে পারে সেটা বাস্তব কিছু, কিংবা অলীকদর্শন (hallucination)। ছবিটা ভেসে উঠতে পারে এক লহমার জন্য, আবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন ধরে থেকে-থেকে, ছাড়া-ছাড়া ভাবে ঝল্‌কে উঠতে পারে। আর এই 'দর্শন' এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ছবিই নয়, শোনা যেতে পারে নানান শব্দ বা কথাও। সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও। আঁধারী ঘরে, ব্রোঞ্জের ট্রাইপডে জলের পাত্রে মিশেল নস্ত্রাদামু হয়তো কিছু দেখতো, কিছু শুনতো।

কোন অলৌকিক, দিব্যশক্তির কাছ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আসা বার্তাই প্রত্যাদেশ। সে-রকম কোন বার্তা কি পৌঁছতো নস্ত্রাদামুর কাছে? আমরা শুধু কল্পনাই করতে পারি।

আবিষ্ট সমাধি অনেকটা নিদ্রার কাছাকাছি অবস্থা। কিন্তু সমাধির সময় চেতনা থাকে, উত্তেজনা থাকে না। আর থাকে এক গভীর সম্মোহিত দশা। অনেক সময়ই এই সম্মোহন আত্ম-সম্মোহনের রূপ নেয়। আবিষ্ট সমাধিকালে যা যা ঘটে, তা সমাধি-পরবর্তী অবস্থায় কখনও কখনও মনে করা যায় না (mediumistio trance) আবার কখনও-বা সেগুলো মনে করা যায় ecstatic trance। ভেবে নেওয়া যায়, মিশেল নস্ত্রাদামু হয়তো দ্বিতীয় ধরনের আবিষ্ট সামাধির গহনে ডুব দিতে পারতেন।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। স্বপ্নদ্রষ্টা তো আমরা সকলেই। ফ্রয়েড, অ্যাড্‌লার, ইয়ুংরা প্রচুর আলোচনা করেছেন স্বপ্নের তাৎপর্য নিয়ে। স্বপ্নের জাল বুনে ভবিষ্যৎ বুঝি পা রাখতো নস্ত্রাদামুর ঘরে।

প্রসঙ্গগুলো বড় জটিল, আর এগুলো কখনও একলা আসে না, ল্যাজে বেঁধে নিয়ে আসে একগাদা বিতর্ককে। এ বইয়ের কাঠামোর সঙ্গে সে বিতর্কটা ঠিক মানানসই নয়। চিন্তাশীল পাঠকের বিশ্লেষণের জন্য উন্মুক্ত থাক প্রসঙ্গটা।

আর হ্যাঁ, যুক্তির বিন্যাস আর পরিস্থিতির নিপুণ বিশ্লেষণও অনেক ভবিষ্যদ্বাণীর জন্ম দেয়। এই অর্থে নানান ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন কার্ল মার্কস অথবা জুল ভার্ণ, জর্জ অরওয়েল কিংবা এইচ.জি. ওয়েল্‌স্, অল্‌ডাস হাক্সলে, লেনিন, জন্ হ্যাকেট্ অথবা স্বামী বিবেকানন্দ (বিবেকানন্দের 'আগামী সমাজবিপ্লব ঘটবে রাশিয়ায় বা চীনে'—কথাগুলো বাস্তব পরিস্থিতির চমৎকার বিশ্লেষণ ছাড়া আর কী?)।

এবার, ভবিষ্যদ্বাণীর অপব্যবহারের প্রসঙ্গ।

অপব্যবহার হয় নানাভাবেই। কখনও হাজির করা হয় পরিবর্তিত ভাষ্য। অর্থাৎ নিজেদের সুবিধামতো একটা 'ভবিষ্যদ্বাণী' খাড়া করে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে জানানো হয় : অমুক ভবিষ্যদ্বক্তা বলে গেছেন এ কথা। কখনও বা পুরোটা জাল না করে নিয়ে আসা হয় বিকৃত ভাষ্য। নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে মানানসই কয়েকটা শব্দ যোগ অথবা বিয়োগ করে পাতে ঢালা হয়। সুপ্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে এ খেলা। বাদ যায়নি নস্ত্রাদামুও। 'প্রফেসিজ'-এর বহু চতুষ্পদীকে বিকৃত করে বাজারে ছাড়া হয়েছে প্রায়শঃই। কারণ ১৫৬৮ সালের সেই প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ আজ পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এরিকা শিথ্যাম্ সাত বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় যোগাড় করেছিল ঐ মূল সংস্করণের একটা কপি। আর শুধু অদল-বদল নয়, অনেক সময় চতুষ্পদীটিকে অবিকৃত রেখেই করা হয়েছে উদ্দেশ্যমূলক ভুল ব্যাখ্যা। সাদা বাংলায়—জুতোর মাপে কাটা হয়েছে পা।

মিশেল নস্ত্রাদামুর ভবিষ্যদ্বাণীর অপব্যবহার শুরু হয়ে গেছে তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পর থেকেই। আমরা জানি, নস্ত্রাদামুর জীবনী প্রথম লেখে তাঁর ছাত্র শ্যাভিনি। শ্যাভিনির পর এই ভবিষ্যদ্বক্তাকে পুঁজি করে বাণিজ্য করতে বাজারে আসে জবার্ট। জবার্টের লেখায় পাওয়া যায় নস্ত্রাদামুর এক 'জ্যেষ্ঠ পুত্রে'র কথা, নাম যার মিখায়েল, বা মিশেল ল্য জুন্। সেজার, আঁদ্রে, চার্লস, মাদেলিন, অ্যানি, ডায়না—নস্ত্রাদামুর সাকুল্যে এই ছয় সন্তান। মিখায়েল আসে কোত্থেকে? আর স্ক্যালিজারের ওখানে সেই প্রথম নারী, প্রথম স্ত্রী আর তার সন্তান। তারা তো ঝরে গিয়েছিল অকালেই। তাহলে?

এই মিখায়েল বা মিশেল ল্য জুন্ নানান ছদ্মনামে লেখালিখি করেছে। আঁতোয়াঁ ক্রেস্প্যাঁ নস্ত্রাদামু নামেও লিখতো সে। নিজেকে সে মিশেল দ্য

নস্ত্রাদামুর জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবেই দাবি করত। ১৫৭৪ সালে সেণ্ট-লুক্ তার কাছে জানতে চান—পুস্যাঁ শহরের ভবিষ্যৎ কী ? বহুক্ষণ চিন্তা করে মিখায়েল উত্তর দেয়—শহরটা ধ্বংস হয়ে যাবে আগুনে ! শত্রু-অধিকৃত পুস্যাঁয় অবাধ লুঠপাট চলার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে একটি লোক, হাতে তার আগুন, শহরের সর্বত্র সে গোপনে আগুন লাগিয়ে বেড়াচ্ছে। লোকটির নাম মিখায়েল ! এক সৈনিকের তরবারি তৎক্ষণাৎ বিদ্ধ করে তাকে। শেষ হয়ে যায় 'ভবিষ্যদ্বক্তা'র খেলা। জানা যায়, চতুর্থ শতকের গ্রীসে এক যশপিপাসু মানুষ আগুন লাগিয়েছিল একটা স্মৃতিস্তম্ভে। সে চেয়েছিল পৃথিবীতে নিজের নামটা অক্ষয় করে রাখতে। ইতিহাসে লেখা আছে ঘটনাটা, হারিয়ে গেছে মানুষটির নাম। হ্যাঁ, এই মিখায়েলের 'প্রেডিক্‌শন্‌স্' নামক একটা গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৬১১ সালে।

১৬৪৯ সালে বাজারে আসে 'প্রফেসিজ্'-এর জাল সংস্করণ। বইটিতে প্রকাশনার বছর হিসেবে মুদ্রিত হয় ১৫৬৮ সাল ! স্পষ্ট এক রাজনীতিক স্বার্থসিদ্ধিই ছিলো এই জাল প্রকাশনার উদ্দেশ্য। পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে যে 'প্রফেসিজ'-এর সপ্তম শতকটা, যে কোন কারণেই হোক, শেষ করতে পারেননি নস্ত্রাদামু। ঐ অসমাপ্ত সপ্তম শতকে, সুকৌশলে, জুড়ে দেওয়া হয় দুটো চতুষ্পদী। কার্ডিনাল ম্যাজারিন্-এর রাজনীতিক প্রতিপত্তিকে খর্ব করার জন্যই কোন ধূর্ত মস্তিষ্ক ঐ দুটো চতুষ্পদীর জন্ম দিয়েছিলো। তাতে বলা যায়—এক গৃহযুদ্ধে পতন হবে ম্যাজারিনের, তার বরাতে নাচছে নির্বাসন দণ্ড। জন্মদাতা মস্তিষ্কটি ধূর্ত, সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন কিছু শব্দ সে ব্যবহার করেছে, যা কোনদিনই ব্যবহার করতেন না নস্ত্রাদামু।

আরেকটা চেষ্টা হয়েছিলো ১৬০৫ সালে। তিন বছর আগে, ১৬০২ সালে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনাকে কায়দা করে ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে ঢুকিয়ে পেশ করা হয়েছিল রাজা চতুর্থ হেনরির কাছে। এই ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। ঠিক এক বছর আগে, ১৬০৪ সালে, মারা যায় শ্যাভিনি। শ্যাভিনির উপস্থিতিতে মিশেল নস্ত্রাদামুকে নিয়ে জালিয়াতির কারবার চালানো খুব সুবিধেজনক ছিল না। তার মৃত্যুর পরেই লাফিয়ে ওঠে একপাল চতুর শৃগাল।

নেপোলিয়ঁ বোনাপার্টের হাতেও পৌঁছে গিয়েছিল নানান জাল সংস্করণ। হিটলারের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। গোয়েব্‌ল্‌সের স্ত্রীর পরামর্শে ব্যবহৃত হয় নস্ত্রাদামুর 'প্রফেসিজ্'। নস্ত্রাদামুকে নিজেদের রক্তমাখা নেশার কাজে লাগাতে চেয়েছিল গোয়েব্‌ল্‌স্। শোনা যায়, আকাশ থেকে ফ্রান্সের বুকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলো একটা প্রচারপত্র। তার বক্তব্য ছিলো :

জার্মানদের যাতায়াতের কতকগুলো পথ থেকে সরিয়ে নিতে হবে উদ্বাস্তুদের। আর এই প্রচারপত্রে ব্যবহার করা হয়েছিল নস্ত্রাদামুর উদ্ধৃতি।

১৯৪১ সালে বেল্‌জিয়ামে প্রকাশিত হয় একটা বই। হিটলারের নিজস্ব জ্যোতিষী আর্নস্ট ক্র্যাফ্‌ট্‌ ঐ বইতে নস্ত্রাদামুর গোটা চল্লিশ চতুষ্পদী নিয়ে আলোচনা করে। এবং আলোচনাটা পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে জার্মান স্বার্থকে, হিটলারের বিজয়কে। এই ক্র্যাফ্‌টকেও পাঠানো হয় কন্‌সেন্‌ট্রেশন্‌ ক্যাম্পে। পথেই মারা যায় ক্র্যাফ্‌ট্‌।

কিন্তু ইংল্যাণ্ডও ছোড়নেওয়ালা নয়। বিশেষ জ্যোতিষী নিয়োগ করে ব্রিটিশ শক্তি। নস্ত্রাদামুর জাল উদ্ধৃতি দিয়ে হরেক কিসিমের প্রচারপত্র ছাপিয়ে গোপনে সেগুলো পাচার করা হয় জার্মানীতে। 'নস্ত্রাদামুর ভবিষ্যদ্বাণীতে এ যুদ্ধের গতিপথ' (Nostradamus predicts the course of the war) নামক একটা পুস্তিকাও ছাপানো হয়। নস্ত্রাদামুর নাম করে বানানো হয় পঞ্চাশখানা চতুষ্পদী, একেবারে লাগ্‌সই ব্যাখ্যাও হাজির করা হয়। ইংল্যাণ্ড জিতবেই, মিত্রশক্তি অপরাজেয়, হিটলার-মুসোলিনীর পরাজয় অবধারিত—এইসব মনোমত 'ভবিষ্যদ্বাণী' দিয়ে পাতা ভরানো হয় ঐ পুস্তিকার। সেফ্‌টন্‌ ডেম্‌লার নামক এক হাতুড়েকে দিয়ে লেখানো হয়েছিল এই জঞ্জালগুলো।

১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয় স্টুয়ার্ড রব্‌-এর 'নেপোলিয়ঁ, হিটলার এবং বর্তমান সঙ্কট প্রসঙ্গে নস্ত্রাদামু' (Nostradamus on Napoleon, Hitler and the Present Crisis) গ্রন্থটি। এতে অবশ্য ইচ্ছাকৃত কোন জালিয়াতি করা হয়নি। কিন্তু যে সমস্ত চতুষ্পদী হাতে পেয়েছেন রব্‌, তার অনেকেগুলোই বিকৃত চতুষ্পদী। নেপোলিয়ঁ প্রসঙ্গে মোটামুটি যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন রব্‌। এসেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গও। আগামী পৃথিবী সম্বন্ধেও খান কুড়ি চতুষ্পদীর স্থান হয়েছে গ্রন্থটিতে।

আর নজির টেনে লাভ নেই। একটা ব্যাপার পরিষ্কার : মানবতার শত্রুরা কাজে লাগায় ভবিষ্যদ্বাণীকে, বিশেষ করে মিশেল নস্ত্রাদামুর মতো ভবিষ্যদ্বক্তা হয়ে ওঠে তাদের 'ফিক্সড্‌ ড়িপোজিট্‌।' শোষণের স্বার্থে, অত্যাচারের যুক্তি দিতে, সারা দুনিয়াকে পদদলিত করার জন্য যুগে যুগে মানুষখেকো মানুষের দল পাশে পেতে চেয়েছে নস্ত্রাদামুকে।

রাজনীতির দক্ষ খেলোয়াড়রা ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে পা রাখার জন্য কোন সুযোগই হাতছাড়া করে না। বহু সময়েই তারা টাকা দিয়ে জ্যোতিষী পোষে। মানুষের কাছে তাদের মাধ্যমে প্রচার চালায়—আমিই সেই চূড়ার মানুষ,

বিধিলিপি কি আর খণ্ডানো যায় হে!

ঠিক এই জায়গাতেই বড় ভয়ঙ্কর রূপ নেয় ভবিষ্যৎকথন। নস্ত্রাদামুর যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলো এতক্ষণ আমরা নেড়েচেড়ে দেখেছি, তার মধ্যেও অনেকগুলোই হয়ে উঠতে পারে কুৎসিত প্রচারের হাতিয়ার। যেমন : শেষ পর্যন্ত জয় হবে আমেরিকার! এই কথাটাকে পুঁজি করে সরলবিশ্বাসী মানুষের মধ্যে তোলা যায় প্রচারের তুফান—সমাজতন্ত্রের পরাজয় অনিবার্য, সমাজতন্ত্র মানুষকে ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারবে না! কোন এক ক্ষমতালোভী উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতে পারে : আমিই সেই তৃতীয় খ্রীষ্টবিরোধী! অথবা, এই খ্রীষ্টবিরোধীকে ব্যক্তি হিসেবে না দেখিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হতে পারে কোন বিশেষ মতবাদ বা মতাদর্শ হিসেবে। চেষ্টা হতে পারে দেখানোর—আসলে মার্কসবাদই সেই খ্রীষ্টবিরোধী ধ্বংসাত্মক মতবাদ, পৃথিবীকে আর একবার জীবন-মরণের সীমানায় টেনে নিয়ে যাবে এই মতাদর্শই!!

এই বিপজ্জনক দিকটার কথা মনে রাখা দরকার।

শেষ কথা

তবুও প্রমিথিয়ুস

দেবরাজ জিউস্ মানুষকে বঞ্চিত করেছিলেন আগুনের অধিকার থেকে। ধরিত্রী তখন অগ্নিহীন। মানুষের বুকে আলোর আর্তি।

এগিয়ে এলো এক মানুষ। বুক-ভরা তার ভালবাসা, শরীরে পৃথিবীর ঘ্রাণ, চোখের গভীরে নক্ষত্রের ঝিকিমিকি।

মানুষের জন্য আগুন আনতে চললো সেই মানুষটি। নাম তার প্রমিথিয়ুস্।

সূর্যের শরীর থেকে, অথবা হেফিস্তাসের কর্মশালা থেকে, সে 'চুরি' করে আনলো পৃথিবীকে আলোয়-আলো করার চাবিকাঠি : আগুন! ঝিল্‌ঝিকমিক দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হলো ধরিত্রী।

মানুষের হাতে আগুন দেখে ক্রুদ্ধ হলেন দেবরাজ জিউস্। প্রমিথিয়ুস্‌কে তিনি বন্দী করলেন ককেশাস্ পর্বতের চূড়ায়। সেখানে বন্দী প্রমিথিয়ুসের যকৃৎ প্রতিদিন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগলো জিউসের ভয়ঙ্কর ঈগল। বহু বছর, বহু যুগ। তিরিশ হাজার বছর!

কিন্তু, আর একজনও এসেছিল। এক বীরত্বের প্রতিমূর্তি : হারকিউলিস্। ভয়ঙ্কর ঈগলকে হত্যা করে সে মুক্ত করেছিল প্রমিথিয়ুস্‌কে। শৃঙ্খলমুক্ত হয়েছিল মানবতা। 'প্রমিথিয়ুস্ বাউণ্ড' শেষ কথা হয়নি, পৃথিবী দেখেছে 'প্রমিথিয়ুস্ আন্‌বাউণ্ড'।

গ্রীক পুরাণের এই গল্পটা আমরা মনে রাখছি।

মিশেল দ্য নস্ত্রাদামু নিঃসন্দেহে এক আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বক্তা। এই ছোট্ট বইয়ের পাতায় পাতায় তার প্রমাণ পেয়েছি আমরা। প্রায় সাড়ে ন'শো ভবিষ্যদ্বাণীর বৃহত্তম অংশটাই উত্তীর্ণ হয়েছে ভবিষ্যতের পরীক্ষায়। আমাদের সামনে এখন আরও কিছু ভবিষ্যৎকথনের বীভৎস মুখব্যাদান।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, রক্তের বন্যা, মৃত্যুর প্লাবন, ধ্বংসের তাণ্ডব, মহামারীর হানা, এক ধ্বংসকর্তার আবির্ভাব এবং পৃথিবীর অনিশ্চিত ভবিতব্য হয়তো-বা সামগ্রিক বিলোপ : 'প্রফেসিজ্'- এর ছত্রে ছত্রে এই পরিণতিই ছড়িয়ে দিয়েছেন নস্ত্রাদামু।

তবু আমরা আস্থা রাখি মানবতায়, আস্থা রাখি মানুষের শুভবোধ, শুভশক্তির ওপর। আমরা বিশ্বাস করতে চাই—যুদ্ধ-মৃত্যু-রক্তই শেষ কথা নয়, ধ্বংসের মরুভূমি পার হয়ে মানুষ পৌঁছবেই কোন-এক সবুজে-সবুজ শস্যক্ষেত্রে। কালো মাটির বুক চিরে, কালো বীজের ভেতর থেকে, কালো মুকুলে মঞ্জরিত হয়ে, আলোর আকাশে মাথা তুলে দাঁড়াবে—বিশ্ব, আমার বিশ্ব।

খ্রীষ্টবিরোধী তৃতীয়জন আসে আসুক, আমরা জানি, মাথা তুলে দাঁড়াবে কোন-এক প্রমিথিয়ুস্, ঋজু পদক্ষেপে এগিয়ে আসবে কোন-এক হারকিউলিস্।

এখন আমাদের প্রমিথিয়ুসের প্রতীক্ষা!

১৯৮৬ থেকে ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শুরু হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ! ধ্বংসের মুখোমুখি সারা দুনিয়া।
কথাটা আজকের নয়। চারশ বছর আগে, ফ্রান্সের এক অমোঘ ভবিষ্যদ্বক্তা উচ্চারণ করেছিলেন এই ভয়ঙ্কর কথাগুলো। নাম তাঁর মিশেল দ নস্ত্রাদামু।
প্রায় সাড়ে ন'শো ভবিষ্যদ্বানী লিখে গিয়েছিলেন নস্ত্রাদামু। তার বহুলাংশ আশ্চর্যজনকভাবে সঠিক—প্রমান দিয়েছে ইতিহাস। চারশ বছর আগের সেই মানুষ নস্ত্রাদামু, ঘোষণা করেছিলেন—বিংশ শতাব্দীতে জার্মানীর বুকে উদিত হবে স্বৈরাচারী, নাম যার হিসটার (হিটলার), যে সারা পৃথিবীকে টেনে নিয়ে যাবে যুদ্ধের রক্তঝরা প্রান্তরে, নির্যাতন করবে মনীষীদের, আর যার প্রতীক-চিহ্ন হবে বাঁকানো ক্রশ (স্বস্তিকা)! ফ্রান্সে নেপোলিয়ঁ বোনাপার্টের অভ্যুত্থানের নির্ভুল ইঙ্গিত দিয়েছিলেন নস্ত্রাদামু। আরও অজস্র ভবিষ্যদ্বানীর মধ্যে আছে—আজকের মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা, পারমানবিক অস্ত্র, মহাকাশ অভিযান, মারী অঁাতোয়ানেত বা বিংশ শতাব্দীর টলোমলো ইওরোপ—সব কিছু। আর আছে রাজনৈতিক ক্ষমতায় অথবা তার খুব কাছাকাছি থাকা একই পরিবারের তিন সদস্যের হত্যার ইঙ্গিত, যা ঘটবে বর্তমান শতাব্দীতে। আমরা হিসেব মেলাই আমেরিকার কেনেডি পরিবারের ঘটনা।

নস্ত্রাদামুর এইসব আশ্চর্য, অমোঘ ভবিষ্যদ্বানী, তার বিশ্লেষণ এবং ঐ রহস্যময় মানুষটির বর্ণময় জীবন নিয়েই এ বই। কুয়াশার আস্তরণ সরিয়ে অতীতের পৃষ্ঠা থেকে এক অজানা অধ্যায়কে উদ্ধার করার চেষ্টা।